২য় পারা

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢)

(১৪২) নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, 'তারা এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই।[১] তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

(১৪৩) এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি,[২] যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে কি□বলার অনুসরণ করছিলে, তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি[৩] যে, কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ (পরিবর্তন) নিশ্চয় কঠিন ব্যাপার।[৪] আর আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান তথা নামায)কে ব্যর্থ করবেন।[৫] নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের

---

(১) যখন রসূল ﷺ হিজরত ক'রে মক্কা থেকে মদীনায় যান, তখন প্রায় ১৬- ১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়েন। তবে তাঁর ইচ্ছা এটাই হত যে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়া হোক যা ইব্রাহীম عليه السلام-এর ক্বিবলা। আর এর জন্য তিনি দুআও করতেন এবং বারবার আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে ইয়াহুদী ও মুনাফিক্বরা হাঙ্গামা শুরু করে দিল। অথচ নামায আল্লাহর এক ইবাদত। আর ইবাদতে আ'বেদ (ইবাদতকারী)কে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইভাবে সে করতে বাধ্য। কাজেই যে দিকে আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন, সে দিকে ফিরে যাওয়া তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই তাঁর; অতএব দিকের কোন গুরুত্ব নেই। প্রত্যেক দিকেই আল্লাহর ইবাদত হতে পারে। কেবল শর্ত হল, সেই দিকটা নির্বাচন করার নির্দেশ যেন আল্লাহ দিয়ে থাকেন। ক্বিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আসরের সময় এসেছিল। ফলে (সর্বপ্রথম) আসরের নামায কা'বা শরীফের দিকে মুখ ক'রে পড়া হয়েছে।

(২) وَسَطٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মধ্যম। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেও ব্যবহার হয়। আর এখানে এই (সর্বোত্তম) অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যেমন তোমাদেরকে সর্বোত্তম ক্বিবলা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মতও করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য দেবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে।" *(সূরা হাজ্জ ৭৮ আয়াত)* কোন কোন হাদীসে এর বিশ্লেষণ এইভাবে এসেছে যে, যখন মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি আমার আদেশ মানুষদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলে?' তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তোমাদের কি কোন সাক্ষী আছে?' তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত।' তখন এই উম্মত সাক্ষ্য দেবে। আর এই জন্য وَسَط এর অনুবাদ ন্যায়পন্থীও করা হয়। *(ইবনে কাসীর)* এ শব্দের আর একটি অর্থ, মধ্যপন্থীও করা হয়। অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদী হল মধ্যপন্থী অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে তারা পবিত্র। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা। এতে অতিরঞ্জন (কোন কিছুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি) এবং অবজ্ঞা (কোন জিনিসকে তার উপযুক্ত মর্যাদা থেকে একেবারে নীচে নামানোরও কোন অবকাশ) নেই।

(৩) لِنَعْلَمَ (যাতে আমি জানতে পারি) আল্লাহ তো আগে থেকেই জানেন। আসলে এর অর্থ হল, যাতে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ীদেরকে সংশয়ীদের থেকে পৃথক করে দি এবং মানুষের সামনেও যেন উক্ত দুই শ্রেণীর লোক স্পষ্ট হয়ে যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৪) এখানে ক্বিবলা পরিবর্তনের একটি উদ্দেশ্যর কথা বলা হচ্ছে। নিষ্ঠাবান মু'মিনরা তো কেবল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চোখের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতেন। কাজেই তাঁদের জন্য একদিক থেকে অন্য দিকে ফিরে যাওয়া কোন সমস্যার ব্যাপার ছিল না, বরং একটি মসজিদে তো ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ তখন পৌঁছে, যখন তাঁরা রুকু'তে ছিলেন। তাঁরা রুকু'র অবস্থাতেই নিজেদের মুখমন্ডল কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। এটাকে 'মসজিদে ক্বিবলাতাইন' (অর্থাৎ, সেই মসজিদ যেখানে একটিই নামায দু'টি ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে পড়া হয়েছে।) বলা হয়। অনুরূপ ঘটনা ক্বুবার মসজিদেও ঘটেছে।

(৫) কোন কোন সাহাবা ﷺ-এর মনে এই সমস্যার উদয় হল যে, যে সাহাবাগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ার যুগে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা আমরা যতদিন সেদিকে মুখ ক'রে নামায পড়েছি, সে সবই মনে হয় বিফলে গেছে, তার মনে হয় কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বললেন, তোমাদের ঐ নামাযগুলো ব্যর্থ হবে না; বরং তোমরা তার পূর্ণ সওয়াব পাবে। আর এখানে নামাযকে বিশ্বাস বা ঈমান বলে আখ্যায়িত করে এ কথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নামায ব্যতীত ঈমানের কোন মূল্য নেই। ঈমান তখনই ঈমান বলে গণ্য হবে, যখন নামায ও আল্লাহর অন্যান্য বিধানসমূহের যত্ন নেওয়া হবে।

প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

رَحِيمٌ (١٤٣)

(১৪৪) আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন কি□বলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব (নামাযে) তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বাগৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, (নামাযে) সেই (কা'বার) দিকে মুখ ফেরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ (বিধান) তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত সত্য।[৬] তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ(١٤٤)

(১৪৫) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন পেশ কর, তবুও তারা তোমার কি□বলার অনুসরণ করবে না[৭] এবং তুমিও তাদের কি□বলার অনুসারী নও[৮] তারাও একে অন্যের কি□বলার অনুসারী নয়।[৯] তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১০]

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٤٥)

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) তেমনই চেনে, যেমন তাদের পুত্রগণকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে।[১১]

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦)

(১৪৭) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত। সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১২]

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)

(১৪৮) প্রত্যেকের (নির্দিষ্ট) একটি দিক আছে, যার দিকে সে মুখ ক'রে দাঁড়ায়।[১৩] অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا

---

(৬) আহলে-কিতাবদের বিভিন্ন সহীফা (ধর্মগ্রন্থ)সমূহে কা'বা শরীফ যে শেষ নবীর ক্বিবলা হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। কাজেই এর সত্যতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাদের জাতিগত হিংসা ও বিদ্বেষ সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

(৭) কারণ, ইয়াহুদীদের বিরোধিতা তো হিংসা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে। যার কারণে প্রমাণাদির কোন প্রভাব তাদের উপর পড়বে না। প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার জন্য অন্তর পরিষ্কার হওয়া অত্যাবশ্যক।

(৮) কারণ, আপনি আল্লাহর অহীর অনুসারী। আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি তাদের ক্বিবলা গ্রহণ করতে পারেন না।

(৯) ইয়াহুদীদের ক্বিবলা হল, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পাথর (যার উপর গম্বুজ নির্মিত আছে)। আর খ্রিষ্টানদের ক্বিবলা হল, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্বদিক। আহলে-কিতাদের এই দু'টি দল যখন আপোসে একটি ক্বিবলার উপর ঐক্যবদ্ধ নয়, তখন তারা মুসলিমদের নিকট থেকে কিভাবে আশা করে যে, তারা (মুসলিমরা) এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হবে?

(১০) এ রকম ধমক পূর্বেও দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, উম্মতকে সতর্ক করা যে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিজাতি ও বিদআতীদের অনুকরণ করা যুলুম, সীমালংঘন ও ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

(১১) এখানে আহলে-কিতাবের একটি দলের সত্যকে গোপন করার অপরাধ সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কারণ, তাদের মধ্যে একটি দল আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ-এর মত লোকেদেরও ছিল। যাঁরা স্বীয় সততা এবং অভ্যন্তরীণ নির্মলতার কারণে ইসলাম গ্রহণ ক'রে ধন্য হোন।

(১২) নবীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধানই অবতীর্ণ হয়, তা অবশ্যই সত্য। সে ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

(১৩) প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেরদের পছন্দ মত ক্বিবলা বানিয়ে রেখেছে যেদিকে তারা মুখ ক'রে থাকে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পন্থা ও তরীকা বানিয়ে রেখেছে। যেমন, কুরআনের অন্য স্থানে এসেছে, [لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ] "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)।" *(সূরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত)* অর্থাৎ, মহান আল্লাহ হিদায়াত ও গুমরাহী উভয় পথকে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে মানুষকে দু'টি পথের মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করার যে স্বাধীনতা দিয়েছেন এরই ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন এমন পথ ও মত অবলম্বন করেছে, যা একে অপরের বিপরীত। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে সবাইকে একই পথের পথিক অর্থাৎ, সবাইকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করতে পারতেন। কিন্তু এটা স্বাধীনতা ছিনিয়ে না নিয়ে সম্ভব ছিল না। আর স্বাধীনতা দেওয়ার উদ্দেশ্য, পরীক্ষাকরণ। অতএব হে মুসলিমগণ! তোমরা

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(١٤٨)

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(١٤٩)

(১৪৯) আর যে স্থান হতেই তুমি বের হও না কেন, মাসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয় তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে (প্রেরিত) সত্য। তোমরা যা করছ, তার ব্যাপারে আল্লাহ উদাসীন নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠)

(১৫০) আর তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, মাসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) দিকে মুখ ফেরাও এবং যেখানেই থাক না কেন, সেই (কা'বার) দিকেই মুখ ফেরাও।[১৪] যাতে তাদের মধ্যে সীমালঘংনকারিগণ[১৫] ছাড়া অন্য কোন লোক তোমাদের সাথে বিতর্ক না করতে পারে।[১৬] সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না,[১৭] বরং একমাত্র আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١)

(১৫১) যেভাবে[১৮] আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদেরই একজনকে রসূল ক'রে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত (বাক্য)সমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করে, তোমাদেরকে (শির্ক হতে) পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (١٥٢)

(১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।[১৯]

সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হও! অর্থাৎ, নেকী ও সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত থাকো। এটাই হল, আল্লাহর অহী এবং রসূল ﷺ-এর অনুসরণের পথ, যা থেকে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বঞ্চিত।

(১৪) ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশের তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। হয় এর উপর তাকীদ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করার জন্য অথবা এই জন্য যে, এটা কোন বিধানকে রহিত ঘোষণা করার প্রথম পরীক্ষা ছিল। তাই মনের মধ্যেকার সন্দেহ-সংশয় ও খুঁতখুঁতে ভাবকে দূর করার জন্য জরুরী ছিল যে, তার বারবার পুনরাবৃত্তি ক'রে মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় করে দেওয়া হোক। আবার এও হতে পারে যে, একাধিক কারণের জন্য এ রকম করা হয়েছে। এক কারণ তো এই ছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর এটা আন্তরিক ইচ্ছা ও আশা ছিল। তা বর্ণনা করার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী ও দাওয়াতদাতার নিজস্ব পৃথক কেন্দ্র (ক্বিবলা) ছিল, তা বর্ণনা ক'রে এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। তৃতীয় কারণ, বিরোধীপক্ষের অভিযোগসমূহের খন্ডনের জন্য তৃতীয়বার তা পুনরুক্ত হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৫) এখানে [ظَلَمُوا] (সীমালংঘনকারী যালেম) থেকে বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা কট্টর বিদ্বেষী, তারা জানে যে, শেষ নবীর ক্বিবলা কা'বাগৃহ হবে, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শত্রুতাবশতঃ বলবে যে, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে ক্বিবলা বানিয়ে মুহাম্মাদ শেষ পর্যন্ত স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।' আবার কারো কাছে সীমালংঘনকারী বলে উদ্দেশ্য হল মক্কার মুশরিকগণ।

(১৬) অর্থাৎ, যাতে আহলে-কিতাব বলতে না পারে যে, আমাদের কিতাবে তো ওদের ক্বিবলা কা'বা শরীফ বলা হয়েছে, অথচ ওরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ছে।

(১৭) 'তাদেরকে ভয় করো না' অর্থাৎ, মুশরিকদের কথার পরোয়া করো না। তারা বলেছিল যে, মুহাম্মাদ তো আমাদের ক্বিবলা গ্রহণ করে নিয়েছে, এবার অতি সত্বর দেখবে সে আমাদের দ্বীনও গ্রহণ করে নেবে। 'আমাকেই ভয় কর' অর্থাৎ, যে নির্দেশ আমি দিতে থাকব, তার উপর নির্ভয়ে আমল করতে থাকো। ক্বিবলার পরিবর্তনকে অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা ও পথপ্রাপ্তি বলে আখ্যায়িত ক'রে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের উপর আমল মানুষকে অনুগ্রহ, পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী বানায় এবং সে সুপথপ্রাপ্তি তথা হিদায়াতের তওফীক্ব লাভ করে।

(১৮) كَمَا (যেভাবে) এর সম্পর্ক পূর্বের বক্তব্যের সাথে। অর্থাৎ, উক্ত অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা এবং হিদায়াতের তওফীক্ব তোমরা ঐভাবেই পেয়েছ, যেভাবে এর আগে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করা হয়েছে, যে তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং এমন বিষয়ও শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

(১৯) অতএব এই অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দরুন তোমরা আমার যিক্‌র ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অকৃতজ্ঞ হয়ে নিয়ামতকে অস্বীকার করো না। আর যিক্‌র (স্মরণ) করার অর্থ হল, সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। অর্থাৎ, 'তাসবীহ' (সুবহানাল্লাহ),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)

(১৫৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।[২০]

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ (١٥٤)

(১৫৪) যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না,[২১] বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)

(১৫৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)

(১৫৬) যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।'

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)

(১৫৭) এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী।[২২]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً

(১৫৮) নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দুটি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।[২৩] সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্ব কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে, তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ (সাঈ) করলে কোন পাপ নেই।[২৪] আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য

'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ) এবং 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতে থাকো। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ হল, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে তাঁর (পক্ষ থেকেই আগত মনে ক'রে তাঁরই সন্তুষ্টি ও) আনুগত্যের পথে ব্যয় করা। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে তাঁর অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। (এবং মুখে আল্লাহর প্রশংসার সাথে তা বয়ান করা।) এ রকম করলে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ তথা নিয়ামতের কুফ্রী করা হয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে আরো অনুগ্রহ লাভের সুসংবাদ এবং অকৃতজ্ঞ হলে কঠিন শাস্তি পাওয়ার কথা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

(২০) মানুষের দু'টি অবস্থা হয়, আরাম ও স্বস্তি এবং কষ্ট ও অস্বস্তি। আরাম ও স্বস্তির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং কষ্ট ও অস্বস্তির সময় ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার তাকীদ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, "মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর ক্ষতিকর কোন কিছু হলে, সে ধৈর্য ধারণ করে। এই উভয় অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর।" *(মুসলিম ২৯৯৯নং)* ধৈর্য দু'প্রকারের। প্রথম হল, হারাম ও পাপ কাজ ত্যাগ করা ও তা থেকে দূরে থাকার উপর এবং লোভনীয় (অবৈধ) জিনিস বর্জন ও সাময়িক সুখ ত্যাগ করার উপর ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয় হল, আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করতে গিয়ে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তা ধৈর্য ও সংযমের সাথে সহ্য করা। কেউ কেউ সবর ও ধৈর্যের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন, আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করা; তাতে দেহ ও আত্মায় যতই কষ্ট অনুভব হোক না কেন। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্মসমূহ থেকে দূরে থাকা; তাতে প্রবৃত্তি ও কামনা তাকে সেদিকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। *(ইবনে কাসীর)*

(২১) শহীদদেরকে মৃত না বলা তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের জন্য। পক্ষান্তরে তাঁদের সে জীবন বারযাখের জীবন যা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির অনেক উর্ধ্বে। এই বারযাখী জীবন মর্যাদার স্তর অনুযায়ী আম্বিয়া, মু'মিনগণ এমন কি কাফেররাও লাভ করবে। শহীদদের আত্মা এবং কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মু'মিনদের আত্মাও একটি পাখীর মধ্যে বা বুকে অবস্থান ক'রে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করবে। *(ইবনে কাসীর, দ্রষ্টব্যঃ আলে-ইমরান ১৬৯ আয়াত)*

(২২) এই আয়াতগুলোতে রয়েছে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ। হাদীসে বিপদের সময় [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ] এর সাথে » « اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا পড়ার ফযীলত ও তাকীদ এসেছে। *(মুসলিম ৯১৮নং)*

(২৩) شَعَائِرُ হল شَعِيْرَةٌ এর বহুবচন। যার অর্থ, নিদর্শন বা প্রতীক। এখানে নিদর্শনসমূহ বলতে হজ্জ আদায়ের সময় ইবাদতের বিভিন্ন স্থান (যেমন, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা, সাঈ ও কুরবানীর স্থান) কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট।

(২৪) স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করা হজ্জের একটি রুকন (প্রধান অঙ্গ)। কিন্তু কুরআনের শব্দ 'কোন পাপ নেই' থেকে কোন কোন সাহাবীর সন্দেহ হয়েছিল যে, স্বাফা-মারওয়ার সাঈ জরুরী নয়। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন বললেন, যদি এর অর্থ এই হত, (যা তোমরা মনে কর) তাহলে মহান আল্লাহ এইভাবে বলতেন, [فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا] (প্রদক্ষিণ বা সাঈ না করলে কোন পাপ নেই।) তারপর এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বললেন যে, আনসার সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে 'মানাত' মূর্তির নামে 'তালবিয়া' পড়ত এবং মুশাল্লাল পাহাড়ে তার পূজা করত। মক্কায়

কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাতা।

فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

(১৫৯) আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।[২৫]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (١٥٩)

(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে) আর নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং (আল্লাহর আয়াতকে) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তো তারা, যাদের তওবা আমি গ্রহণ করি। আর আমি তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠)

(১৬১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে (কাফের) এবং অবিশ্বাসী (কাফের) থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।[২৬]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١)

(১৬২) তারা চিরকাল তাতে (অভিসম্পাত ও দোযখে) অবস্থান করবে, তাদের শাস্তিকে লঘু করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ (١٦٢)

(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ)। তিনি ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই,[২৭] তিনি চরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ(١٦٣)

(১৬৪) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে তাদের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ ক'রে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন[২৮] এবং সকল প্রকার প্রাণী

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ

পৌঁছে এই ধরনের লোক স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করাকে পাপ মনে করত। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয়েছে, স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করা গুনাহ নয়। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হজ্জ ঃ পরিচ্ছেদ ঃ স্বাফা-মারওয়ার সাঈ ওয়াজিব)* কেউ কেউ এর কারণ এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলিয়াতে মুশরিকরা স্বাফা পাহাড়ে 'ইসাফ' এবং মারওয়ায় 'নায়েলা' নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল। সাঈ করার সময় তারা এদেরকে চুম্বন বা স্পর্শ করত। যখন তারা ইসলাম কবুল করে, তখন তাদের মাথায় এই খেয়াল এল যে, মনে হয় স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করলে গুনাহ হতে পারে। কারণ, ইসলামের পূর্বে তারা উক্ত দু'টি মূর্তির জন্য সাঈ করত। মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদের সন্দেহ ও মনের কিন্তুকে দূর করে দিয়েছেন। এখন (উমরাহ ও হজ্জে ৭ বার যাওয়া-আসার মাধ্যমে) এই সাঈ করা জরুরী। যার শুরু স্বাফা থেকে হবে এবং শেষ হবে মারওয়ায়। *(আইসারুত তাফাসীর)*

(২৫) মহান আল্লাহ যে সকল কথা কুরআন মাজীদে অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করা এত বড় অন্যায় যে, আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্য অভিশাপকারীরা অভিশাপ দিতে থাকে। তাছাড়া হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, হাকেম অনুরূপ।)

(২৬)এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা যাবে যে, সে কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তার উপর অভিসম্পাত করা জায়েয। এ ছাড়া কোন পাপী মুসলিমের উপর অভিসম্পাত করা জায়েয নয়, তাতে সে যতই বড় পাপী হোক না কেন। কারণ, হতে পারে যে, মৃত্যুর পূর্বে সে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে নিয়েছে অথবা মহান আল্লাহ তার অন্যান্য নেক আমলসমূহের কারণে তার পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা আমরা জানতে পারি না। অবশ্য কোন কোন পাপ কাজের দরুন লা'নত বা অভিশাপ করার কথা (শরীয়তে) এসেছে, এ পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, অভিসম্পাত বয়ে আনে এমন কাজ তারা করছে। এ রকম কাজ থেকে যদি তারা তওবা না করে, তাহলে আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত গণ্য হতে পারে।

(২৭) এই আয়াতে আবারও তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাওহীদের এই দাওয়াত মক্কার মুশরিকদের জন্য বোধগম্য ছিল না। তারা বলল, [أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ] "সে কি এতগুলো উপাস্যের পরিবর্তে একটি মাত্র উপাস্য সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" *(সূরা স্বা-দ ঃ ৫ আয়াত)* এই জন্যই পরের আয়াতে এই তাওহীদের প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে।

(২৮) এই আয়াতটি বহুল অর্থবিশিষ্ট। কারণ, বিশ্বজাহানের সৃষ্টি এবং তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, যা অন্য কোন আয়াতে নেই। (ক) আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ঃ যার ব্যাপকতা ও বিশালতা

وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর বায়ুরাশির প্রবাহের মধ্যে (গতি পরিবর্তনে) এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী (আল্লাহর আজ্ঞাধীন ভাসমান) মেঘের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (আল্লাহর মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لله جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥)

(১৬৫) আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে,[২৯] কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।[৩০] আর অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি বুঝত যে, সমুদয় ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর, (তাহলে কতই না উত্তম হত)।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ (١٦٦)

(১৬৬) (স্মরণ কর) যখন অনুসৃত ব্যক্তিবর্গরা অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ

(১৬৭) অনুসারীরা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল!' এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না।[৩১]

বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। (খ) রাত ও দিনের একের পর এক আসা। দিনকে উজ্জ্বল এবং রাতকে অন্ধকার করা ঃ যাতে জীবিকার জন্য কাজকর্মও যেন হয় এবং আরামও যেন করা যেতে পারে। আবার রাত বড় ও দিন ছোট হওয়া। অনুরূপ এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হওয়া। (গ) সমুদ্রে নৌকা ও পানিজাহাজের চলাচল ঃ যার সাহায্যে ব্যবসার সফরও হয় এবং জীবিকা নির্বাহের টন টন পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছানো হয়। (ঘ) বৃষ্টি ঃ যা যমীনের উর্বরতা ও শ্যামলতার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। (ঙ) বিভিন্ন প্রকারের পশু-সৃষ্টি ঃ যা বহন, চাষাবাদ এবং যুদ্ধেও কাজে আসে। এমন কি মানুষের খাদ্যের একটা বড় পরিমাণ প্রয়োজন এদের দিয়ে পূরণ হয়। (চ) সব রকমের হাওয়া প্রবাহিতকরণ ঃ ঠান্ডা ও গরম, উপকারী ও অপকারী। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী, আবার উত্তর ও দক্ষিণমুখী; মানুষের জীবন এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। (ছ) মেঘের সৃষ্টি ঃ যার দ্বারা মহান আল্লাহ যেখানে চান, সেখানেই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই যাবতীয় বিষয়াদি কি মহান আল্লাহর মহাশক্তি ও তাঁর একত্ববাদকে প্রমাণ করে না? অবশ্যই করে। এই সৃষ্টিসমূহ এবং তার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর কি কোন শরীক আছে? না, অবশ্যই না। তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

(২৯) উল্লিখিত সুস্পষ্ট দলীলাদি ও অকাট্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও বহু মানুষ এমনও রয়েছে, যারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত না ক'রে তাঁর সাথে অন্যদেরকে তাঁর শরীক স্থাপন ক'রে থাকে। তাদের সাথে ঐরূপ ভালবাসা পোষণ করে, যেরূপ ভালবাসা আল্লাহর সাথে হওয়া উচিত। আর এটা যে কেবল মহানবী ﷺ-এর আগমনের সময়ই ছিল তা নয়, বরং শির্কের এই প্রচলন বর্তমানেও ব্যাপক। বর্তমানে ইসলামের দাবীদারদের মধ্যেও এ রোগ সংক্রমণ করেছে। তারা গায়রুল্লাহ, পীর, ফকীর এবং মাজারের গদিনশীনদেরকে কেবল নিজেদের (বিপদে) আশ্রয়স্থল, (মুক্তির) আধার, প্রয়োজনপূরণের ক্বিবলা বানিয়ে রেখেছে যে তা নয়, বরং তারা তাদেরকে আল্লাহর থেকেও বেশী ভালবাসা দান করেছে! তাওহীদের দর্স ও নসীহত তাদেরকেও ঐরূপ অপছন্দ লাগে, যেরূপ মক্কার মুশরিকদেরকে লাগত। ক্বুরআনের এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের সে চিত্র তুলে ধরে বলেন, [وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ] "যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, 'আল্লাহ এক' --একথা বলা হলে তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং তিনি ছাড়া অন্য (উপাস্য)দের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" *(সূরা যুমার ৪৫ আয়াত)* اشْمَأَزَّتْ মানে হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া।

(৩০) তবে ঈমানদাররা মুশরিকদের বিপরীত, তাদের ভালোবাসা মহান আল্লাহরই সাথে সর্বাধিক হয়। কেননা, মুশরিকরা যখন সমুদ্রে ইত্যাদিতে বিপদে ফেঁসে যায়, তখন তারা নিজেদের উপাস্য ভুলে গিয়ে কেবল মহান আল্লাহকেই ডাকে। [فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] {العنكبوت: ٦٥} [وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] {لقمان: ٣٢} [وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] {يونس:٢٢} এই আয়াতগুলোর সারমর্ম হল, মুশরিকরা কঠিন বিপদের সময় সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহকেই ডাকত।

(৩১) আখেরাতে পীর ও গদিনশীন মাজারীদের অপারগতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে মুশকিরা আফসোস করবে, কিন্তু সেখানে

بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ (١٦٧)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

(১৬৮) হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না,[৩২] নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

(১৬৯) সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

(১৭০) আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর।' তখন তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না।[৩৩]

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (١٧١)

(১৭১) আর এই অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনে (বুঝে) না তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তো (তারা) কিছুই বুঝতে পারে না।[৩৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

(১৭২) হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক।[৩৫]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ

(১৭৩) নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন।[৩৬] কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী

তখন সে আফসোস ও অনুতাপের কোন ফল হবে না। হায়! দুনিয়াতেই যদি তারা শির্ক থেকে তওবা করত! (তাহলে তারা মুক্তি পেয়ে যেত।)

(৩২) অর্থাৎ, শয়তানের অনুসরণ ক'রে আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করো না, যেমন মুশরিকরা করেছিল। তারা তাদের মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত পশুকে নিজেদের উপর হারাম ক'রে নিত। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআমে (১৩৬-১৪০ আয়াতে) আসবে। হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত ক'রে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম, সেসব জিনিস তাদের উপর হারাম করে দেয়।" *(সহীহ মুসলিম ২৮৬৫নং)*

(৩৩) আজও যদি বিদআতীদেরকে বুঝানো হয় যে, এই বিদআতগুলোর দ্বীনে কোন ভিত্তি নেই, তবে তারা এই উত্তরই দেয় যে, এই প্রথাগুলো তো আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকেই চলে আসছে। অথচ হতে পারে যে, পূর্বপুরুষরাও দ্বীনী ব্যাপারে অজ্ঞ এবং হিদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই শরীয়তের দলীলের মোকাবেলায় বাপ-দাদার (অন্ধ) অনুকরণ বা ইমাম ও আলেমদের অনুসরণ করা ভুল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে (ভ্রষ্টতার) এই কর্দম থেকে বের করুন! (আমীন)

(৩৪) যে কাফেররা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে অকেজো ক'রে রেখেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই পশুদের মত, যাদেরকে রাখাল ডাকে ও আওয়াজ দেয় এবং তারা সেই ডাক ও আওয়াজ তো শোনে, কিন্তু বুঝে না যে, তাদেরকে কেন ডাকা ও আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে? অনুরূপ এই অন্ধ অনুকরণকারীরা বধির, তাই সত্যের ডাক শোনে না। বোবা, তাই হক কথা তাদের জবান থেকে বের হয় না। অন্ধ, তাই সত্য দেখতে তারা অক্ষম এবং জ্ঞানশূন্য, তাই সত্যের দাওয়াত এবং তাওহীদ ও সুন্নতকে তারা বুঝতে পারে না। এখানে دعاء (ডাক) অর্থ নিকটের শব্দ এবং نداء (হাঁক) অর্থ দূরের শব্দ।

(৩৫) এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে সেই সমস্ত পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তাকীদ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসগুলোই পাক-পবিত্র এবং তাঁর হারামকৃত জিনিসগুলো অপবিত্র; যদিও তা মানুষের কাছে প্রিয় ও তৃপ্তিকর। (যেমন, ইউরোপবাসীদের নিকট শুয়োরের গোশ্ত খুবই প্রিয়)। দ্বিতীয়তঃ মূর্তিদের নামে উৎসর্গীকৃত জানোয়ার ও জিনিসাদি মুশরিকরা যে নিজেদের উপর হারাম করে নিত (যার বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআম ১৩৬-১৪০ আয়াতে আসবে), তাদের এ কাজ ভুল ছিল, এইভাবে কোন হালাল জিনিস হারাম হয় না। তোমরাও তাদের মত (হালালকে) হারাম করো না। (হারাম কেবল সেই জিনিসগুলো যার বর্ণনা পরের আয়াতে রয়েছে।) তৃতীয়তঃ যদি তোমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত সম্পাদনকারী হও, তাহলে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে যত্নবান হও।

(৩৬) এই আয়াতে চারটি হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে إنما শব্দ দ্বারা সীমিতকরণে এই সন্দেহের সৃষ্টি

কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

(১৭৪) আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(١٧٤)

(১৭৫) তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে, (দোযখের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)

(১৭৬) এসব এ জন্য যে, আল্লাহ সত্যস্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, বস্তুতঃ যারা (কিতাবের মধ্যে) মতভেদ এনেছে, তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

হয় যে, হারাম কেবল এই চারটি জিনিসই। অথচ এ ছাড়াও আরো অনেক জিনিস হারাম আছে। তাই প্রথমতঃ এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই সীমিতকরণ বিশেষ কথা প্রসঙ্গে এসেছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা হালাল জানোয়ারকেও হারাম ক'রে নিত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হারাম শুধুমাত্র এইগুলো। কাজেই এই সীমিতকরণ তুলনামূলক। অর্থাৎ, এ ছাড়াও আরো হারাম জিনিস আছে যা এখানে উল্লিখিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ হাদীসে প্রাণীর হালাল-হারাম সংক্রান্ত দু'টি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আয়াতের সঠিক তাফসীর হিসেবে সামনে রাখা উচিত। হিংস্র পশুর মধ্যে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট পশু এবং পাখীর মধ্যে শিকারী নখ বিশিষ্ট পাখী হারাম। তৃতীয়তঃ যেসব পশুর হারাম হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যেমন গাধা, কুকুর ইত্যাদি, সেগুলোও হারাম। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হাদীসও ক্বুরআনের মত দ্বীনের উৎস এবং শরীয়তের দলীল। দুটোকে মেনে নিলেই দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, শুধু ক্বুরআন মানলে ও হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে দ্বীন পরিপূর্ণ হবে না। 'মৃত' বলতে, এমন হালাল পশু যা যথানিয়মে যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন দুর্ঘটনায় (বিস্তারিত আলোচনা সূরা মায়েদাহ ৩নং আয়াতে আছে) মারা গেছে কিংবা শরীয়তের তরীকার পরিপন্থী নিয়মে যাকে যবেহ করা হয়েছে; যেমন, গলা টিপে অথবা পাথর ও লাঠির আঘাত ইত্যাদি দ্বারা মারা হয়েছে কিংবা বর্তমানের যান্ত্রিক যবেহ দ্বারা মারা হয়েছে যা আসলে আঘাত দিয়ে হত্যা করার শামিল (তা আসলে মৃত এবং হারাম)। তবে হাদীসে দু'টো মৃত প্রাণী বৈধ করা হয়েছে। আর তা হল, মাছ ও পঙ্গপাল। এ দু'টো মৃত হারাম হওয়ার বিধান থেকে স্বতন্ত্র। 'রক্ত' বলতে প্রবাহিত রক্ত। অর্থাৎ, যবেহ করার পর যে রক্ত বের হয়ে বয়ে যায়। গোশ্তের সাথে যে রক্ত লেগে থাকে, তা হালাল। এছাড়াও দু'টো রক্তকে হাদীসে বৈধ বলা হয়েছে ঃ কলিজা (লিভার) এবং তিল্লী (প্লীহা)।

শুয়োর নিকৃষ্ট জানোয়ার; বিধায় আল্লাহ তাকে হারাম করেছেন। শরীয়তে এমন জানোয়ারও হারাম, যাকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। যেমন, আরবের মুশরিকরা লাত এবং উয্যা ইত্যাদির নামে এবং অগ্নিপূজকরা আগুনের নামে (বা উদ্দেশ্যে) যবেহ করত। আর এরই আওতাভুক্ত হল সেই পশু, যাকে অজ্ঞ মুসলিমরা মৃত ওলীদের ভালবাসায়, তাদের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা তাদের ভয়ে এবং তাদের নিকট (কোন কিছু পাওয়ার) আশায় কবর ও আস্তানাসমূহে যবেহ করে বা আস্তানার খাদেমকে ওলীর নামে দান ক'রে আসে। (যেমন, অনেক আউলিয়ার কবরে সাইনবোর্ড লাগানো আছে যে, 'দাতা' সাহেবের নামে দান করার জন্য গরু-ছাগল এখানে জমা করুন।) ওলীর নামে উৎসর্গীকৃত এই পশুগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করা হলেও তা হারাম। কারণ, এ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নয়, বরং কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভ, গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথবা তার (অতিপ্রাকৃত) ভয়ে বা তার নিকট (কিছু পাওয়ার) আশা ক'রে করা হয়; যা শির্ক। অনুরূপ পশু ছাড়াও যেসব জিনিস গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা হয়, তা সবই হারাম। যেমন, কবরে নিয়ে গিয়ে অথবা সেখান থেকেই ক্রয় ক'রে সেখানে উপস্থিত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে ডেগচির খয়রাতী খাবার কিংবা মিষ্টি ও টাকা-পয়সা বন্টন কিংবা নযরানার বাক্সে মানত ও দানের টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা উরসের সময় সেখানে দুধ ইত্যাদি খাদ্য পাঠানো; এ সমস্ত কার্যকলাপ হারাম ও অবৈধ। কেননা, এ সবই গায়রুল্লাহর নামে মানত ও দান করা বিবেচিত হয়। মানত করাও নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত একটি ইবাদত। আর সর্বপ্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে, "সে অভিশপ্ত, যে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে।" *(সহীহুল জা'মে আলবানী ২/ ১০২৪)* তাফসীরে নিশাপুরীর হাওয়ালায় তাফসীরে আযিযীতে উল্লেখ হয়েছে যে, ((أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِماً ذَبَحَ ذَبِيْحَةً يُرِيْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، صَارَ مُرْتَدًّا وَذَبِيْحَتُهُ ذَبِيْحَةُ مُرْتَدٍّ)) 'আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যদি কোন মুসলিম গায়রুল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, তাহলে সে মুর্তাদ্দ (দ্বীন থেকে খারিজ) হয়ে যাবে এবং তার যবেহ করা পশু একজন মুর্তাদ্দের যবেহকৃত পশুর মত হবে। *(তাফসীরে আযিযী ৬১১পৃষ্ঠা আশরাফুল হাওয়াশীর বরাতে)*

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(١٧٧)

(১৭৭) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই;[৩৭] কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

(১৭৮) হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কি□স্বাসের (প্রতিশোধগ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।[৩৮] কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয়

---

(৩৭) এই আয়াত ক্বিবলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। একদিকে ইয়াহুদীরা নিজেদের ক্বিবলার (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পশ্চিম দিক) এবং খ্রিষ্টানরা তাদের ক্বিবলার (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্ব দিক)কে বড়ই গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং এ নিয়ে গর্বও করছিল, অন্য দিকে মুসলিমদের ক্বিবলার পরিবর্তনকে কেন্দ্র ক'রে তারা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করছিল। যার কারণে কোন কোন মুসলিমও অনেক সময় আন্তরিক দুঃখবোধ করত। তাই মহান আল্লাহ বললেন, আসলে পশ্চিম ও পূর্বের দিকে মুখ করাটাই স্বয়ং কোন নেকীর কাজ নয়, বরং এটা তো কেবল এককেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ করণের একটি পদ্ধতি মাত্র। প্রকৃত নেকী হল, আক্বীদা সম্পর্কীয় সেই সব জিনিসের উপর ঈমান আনা, যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সব আমল ও নৈতিকতার প্রতি যত্ন নেওয়া, যার তিনি তাকীদ করেছেন। এর পরবর্তীতে সেই আক্বীদা ও আমলগুলো বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান (বিশ্বাস) হল এই যে, তাঁকে তাঁর সত্তা, উপাস্যত্ব ও গুণাবলীতে একক মনে করা, সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁকে পাক-পবিত্র মনে করা এবং কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর কোন অপব্যাখ্যা না ক'রে বা তার কোন কিছুকে নিষ্ক্রিয় না মনে ক'রে এবং তার কোন ধরন-গঠন নির্ণয় না ক'রে তা মেনে নেওয়া। শেষ বিচার দিবস, পুনরুত্থান এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করা। 'কিতাব' বলতে সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনা। ফিরিশ্তাদের অস্তিত্ব ও সকল নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসসমূহের সাথে সাথে আয়াতে উল্লিখিত আমলগুলোর প্রতিও যত্ন নিতে হবে। عَلَى حُبِّهِ (ه) সর্বনাম মালের দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ, মালের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তা ব্যয় করা। الْبَأْسَاء থেকে দারিদ্র্য এবং অতীব অভাব الضَّرَّاء থেকে ক্ষতি ও রোগ এবং الْبَأْسِ থেকে যুদ্ধ ও তার কঠিনতাকে বুঝানো হয়েছে। এই তিনটি অবস্থায় ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানাদি থেকে বিমুখ না হওয়া বড় কঠিন কাজ, তাই এই তিনটি অবস্থাকে বিশেষ ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩৮) জাহেলিয়াতের যুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, তাই সবল গোত্রগুলো দুর্বল গোত্রগুলোর উপর যেভাবে চাইতো যুলুম-অত্যাচার করত। তাদের যুলুমের একটি প্রকার এ রকম ছিল যে, যদি সবল গোত্রের কোন পুরুষ হত্যা হয়ে যেত, তাহলে তারা কেবল হত্যাকারীকে হত্যা করার পরিবর্তে তার (হত্যাকারীর) পরিবারের কয়েকজনকে এমন কি কখনো কখনো পুরো গোত্রকে বিনাশ করার প্রচেষ্টা করত এবং মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে ও ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত। মহান আল্লাহ এই ভেদাভেদ উচ্ছেদ ক'রে বললেন, যে হত্যা করবে, ক্বিসাসে (প্রতিশোধ গ্রহণে) কেবল তাকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি হলে, বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই, ক্রীতদাস হলে, ঐ ক্রীতদাসকেই এবং মহিলা হলে, ঐ মহিলাকেই হত্যা করা হবে। ক্রীতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে, মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে অথবা একজন পুরুষের পরিবর্তে কয়েকজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ যদি মহিলাকে হত্যা করে, তাহলে ক্বিস্বাসে কোন মহিলাকে হত্যা করা হবে অথবা মহিলা যদি পুরুষকে হত্যা করে, তবে ক্বিস্বাসে কোন পুরুষকে হত্যা করা হবে (যেমন শব্দের বাহ্যিক ভাবার্থ থেকে এটাই ফুটে উঠছে)। বরং শব্দগুলো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ অনুপাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে; যার পরিষ্কার অর্থ (লক্ষ্যার্থ) হল, ক্বিস্বাসে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। তাতে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, সবল হোক কিংবা দুর্বল। হাদীসে এসেছে, "সমস্ত মুসলিমের রক্ত (পুরুষ হোক বা মহিলা) সমান।" *(আবূ দাউদ ২৭৫১)* সুতরাং, আয়াতের অর্থ হল তা-ই যা অন্য আয়াতে এসেছে, "প্রাণের বদলে প্রাণ।" *(মাইদাহ ৪৫ আয়াত)* হানাফী উলামাগণ এই আয়াত থেকে সাব্যস্ত করেছেন যে, মুসলিমকে কাফেরের ক্বিস্বাসে হত্যা করা যাবে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ এ কথার সমর্থন করেননি। কারণ, হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, "মুসলিমকে কাফেরের ক্বিস্বাসে হত্যা করা যাবে না।" *(বুখারী ১১১নং, ফাতহুল ক্বাদীর, আরো দেখুন সূরা মাইদার ৪৫নং আয়াতের টীকা।)*

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

পরিশোধ করা উচিত।[৩৯] এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।[৪০] এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।[৪১]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(١٧٩)

(১৭৯) হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।[৪২]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ(١٨٠)

(১৮০) তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে 'অসিয়ত' করার বিধান দেওয়া হল।[৪৩] ধর্মভীরুদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)

(১৮১) অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে, তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)

(১৮২) তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর (সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে,[৪৪] অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল ক'রে) সন্ধি ক'রে দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম

---

(৩৯) ক্ষমা ক'রে দেওয়ার দু'টি পদ্ধতি। যথা ঃ (ক) মালের কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা ক'রে দেওয়া। (খ) ক্বিসাসের পরিবর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ ক'রে নেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে মুক্তিপণের দাবীদারকে বলা হয়েছে যে, সে যেন প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে। আর [وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ]এ হত্যাকারীকে বলা হচ্ছে যে, সে যেন কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি না ক'রে বিনিময় ভালভাবে আদায় ক'রে দেয়। হতের আত্মীয়রা তার প্রাণ না নিয়ে তার উপর যে অনুগ্রহ করল, তার বদলাও অনুগ্রহের সাথে হওয়া দরকার। (الرحمن:٦٠) [هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ]

(৪০) এই লাঘব এবং অনুগ্রহ (অর্থাৎ, ক্বিস্বাস, ক্ষমা অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ এই তিনটি পদ্ধতিই) আল্লাহর পক্ষ থেকে খাস তোমাদের জন্যই। ইতিপূর্বে তাওরাতধারীদের জন্য কেবল ক্বিস্বাস ও ক্ষমা ছিল। মুক্তিপণ ছিল না। আর ইঞ্জীলধারীদের মাঝে কেবল ক্ষমা ছিল; ক্বিস্বাস ছিল না এবং মুক্তিপণও না। *(ইবনে কাসীর)*

(৪১) মুক্তিপণ গ্রহণ করার পর যদি আবার হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তা সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি হবে এবং এর শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে এবং আখেরাতেও।

(৪২) যখন হত্যাকারীর এই ভয় হবে যে, আমাকেও ক্বিস্বাসে হত্যা করা হবে, তখন সে কাউকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। যে সমাজে ক্বিস্বাসের আইন বলবৎ থাকে, সে সমাজে এ (ক্বিস্বাসে হত্যা হওয়ার) ভয় সমাজকে হত্যা ও খুনোখুনি থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং এরই ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর এর (বাস্তব) দৃশ্য আজও সৌদী আরবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, যেখানে -আলহামদু লিল্লাহ- ইসলামী দন্ড-বিধির কার্যকারিতার বরকতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যদি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও ইসলামী দন্ড-বিধি কার্যকরী ক'রে জনসাধারণের জন্য শান্তিময় জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে কতই না ভাল হত!

(৪৩) 'অসিয়ত' (উইল) করার এ নির্দেশ উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর উক্তি হল, ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)) অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ, ওয়ারেসীনদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন)। অতএব কোন উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়।" *(আবূ দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১, নাসায়ী ৩৫৮১, ইবনে মাজা ২৭১৩, আহমদ ১৭২১২নং)* তবে এমন আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা যাবে, যে ওয়ারিস নয়। অনুরূপ সৎপথে ব্যয় করার জন্য অসিয়ত করা যাবে আর তার সর্বাধিক পরিমাণ হল (মোট সম্পত্তির) এক তৃতীয়াংশ। এর বেশী অসিয়ত করা যাবে না। *(সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ ফারায়েয, পরিচ্ছেদ ঃ মিরাসুল বানাত)*

(৪৪) পক্ষপাতিত্ব করা বা ঝুঁকে পড়া-এর অর্থ হল, ভুলে গিয়ে কোন এক আত্মীয়র প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে অন্যের অধিকার হরণ করে। আর 'অন্যায়'-এর অর্থ হল, জেনে-শুনে এ রকম করা। *(আইসারুত্ তাফাসীর)* অথবা 'অন্যায়'এর অর্থ হল, অন্যায় অসিয়ত, যা পরিবর্তন করা এবং তা কার্যকরী না করা অত্যাবশ্যক। এ থেকে জানা গেল যে, অসিয়তে ন্যায় ও সুবিচারের খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। তা না হলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অবিচার করার অপরাধে তার পারলৌকিক মুক্তি অতীব কঠিন হয়ে যাবে।

ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

(১৮৩) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার।[৪৫]

أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

(১৮৪) (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে।[৪৬] আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না[৪৭] (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়।[৪৮] আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

(১৮৫) রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৪৯] অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন

([৪৫]) صوم صـــيام এর (মাসদার/ক্রিয়ামূল)। এর শরীয়তী অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং যৌনবাসনা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা। এই ইবাদতটা যেহেতু আত্মাকে পবিত্র ও শুদ্ধি করণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা তোমাদের পূর্বের উম্মতের উপরেও ফরয করা হয়েছিল। এই রোযার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল তাক্বওয়া, পরহেযগারী তথা আল্লাহভীরুতা অর্জন। আর আল্লাহভীরুতা মানুষের চরিত্র ও কর্মকে সুন্দর করার জন্য মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে।

([৪৬]) রোগী ও মুসাফিরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা রোগ ও সফরের কারণে যে কয়েক দিন রোযা রাখতে পারেনি, পরে সে দিনগুলো রোযা রেখে (২৯/৩০) সংখ্যা পূরণ করে নেবে।

([৪৭]) «يُطِيقُونَهُ»এর অর্থ নেওয়া হয়েছে «يَتَحَشَّمُونَهُ» অর্থাৎ, "অতীব কষ্ট করে রোযা রাখে"। (এটা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী এই তরজমাকে পছন্দ করেছেন।) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেশী বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়ার কারণে অথবা আরোগ্য লাভের আশা নেই এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার কারণে রোযা রাখতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, সে এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এর অর্থ 'রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে' করেছেন। আর এ অর্থে এর ব্যাখ্যা হল, ইসলামের প্রথম পর্যায়ে রোযা রাখার অভ্যাস না থাকার ফলে সামর্থ্যবানদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা রোযা রাখতে না পারলে এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরে [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُـــمْهُ] আয়াত অবতীর্ণ হলে আগের বিধান রহিত ক'রে প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উপর রোযা ফরয করা হয়। কেবল বৃদ্ধ ও চিররোগা ব্যক্তির জন্য এই বিধান অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। তারা রোযার পরিবর্তে খাদ্য দান করবে। গর্ভিণী এবং দুগ্ধদাত্রী মহিলাদের রোযা রাখা কষ্টকর হলে, তারাও রোগীর বিধানের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ, তারা রোযা না রেখে পরে তার কাযা করবে। *(তুহফাতুল আহওয়াযী)*

([৪৮]) যে সানন্দে একজন মিসকীনের স্থানে দু' বা তিনজন মিসকীনকে খাদ্য দান করে, তার জন্য এটা খুবই ভাল।

([৪৯]) রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন এক রমযানে পূর্ণ কুরআনকে নাযিল করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ এই যে, রমযানের কদরের রাতে 'লাওহে মাহফূয' থেকে নিকটের আসমানে পূর্ণ কুরআন একই সাথে অবতীর্ণ করা হয় এবং সেখানে 'বায়তুল ইয্যাহ'তে রেখে দেওয়া হয়। ওখান থেকে ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে প্রয়োজনের তাকীদে এবং অবস্থা অনুপাতে কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হতে থাকে। *(ইবনে কাসীর)* সুতরাং এ রকম বলা যে, কুরআন রমযান মাসে অথবা কদরের রাতে কিংবা পবিত্র বা বর্কতময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সবই সঠিক। কারণ, 'লাউহে মাহফূয' থেকে তো রমযান মাসেই নাযিল করা হয়েছে। আর 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' (কদরের রাত) ও 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' পবিত্র বা বর্কতময় রাত একটাই রাত। অর্থাৎ, তা হল শবেকদর। আর শবেকদর রমযান মাসেই আসে। কারো কারো নিকট এর তাৎপর্য হল, রমযান মাসে কুরআন নাযিল আরম্ভ হয় এবং হিরা গুহায় প্রথম অহীও রমযান মাসেই আসে। তাই এইদিক দিয়ে কুরআন মাজীদ এবং রমযান মাসের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি গভীর। আর এই জন্যই নবী করীম ﷺ এই পবিত্র মাসে জিব্রাঈল ﷺ-এর সাথে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন এবং যে বছরে তাঁর মৃত্যু হয়, সে বছর তিনি ﷺ জিব্রাঈলের সাথে দু'বার কুরআন পুনরাবৃত্তি করেন। রমযানের (২৩, ২৫, ২৭ এই) তিন রাত তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে জামাআতের সাথে নামাযও পড়েন। যাকে এখন তারাবীহর নামায বলা হয়। *(সহীহ তিরমিযী ও সহীহ ইবনে মাজা আলবানী)* এই তারাবীহর নামায বিত্‌র সহ ১১ রাকআতই ছিল, যার বিশদ বর্ণনা জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে (কিয়ামুল্লাইল, মারওয়াযী ইত্যাদিতে) এবং আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে (সহীহ বুখারীতে) বিদ্যমান রয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ার কথা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে যেহেতু কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম ﷺ থেকে ১১ রাকআতের বেশী পড়া প্রমাণিত,

وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(١٨٥)

তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা (রোযার) নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

(১৮৬) আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।[৫০] অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন, তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।[৫১] অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।[৫২] আর তোমরা মসজিদে 'ইতিকাফ' রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না।[৫৩] এগুলি আল্লাহর সীমারেখা;

সেহেতু কেবল নফলের নিয়তে ২০ রাকআত এবং তার থেকে কম ও বেশী পড়া যেতে পারে।

(৫০) বর্তমময় রমযান মাসের বিধি-বিধান ও মসলা-মাসায়েলের সাথে দুআর কথা উল্লেখ ক'রে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, রমযান মাসে দুআরও বড় ফযীলত রয়েছে। অতএব এ মাসে দুআর প্রতি খুব যত্ন নেওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে রোযা থাকা অবস্থায়। কেননা, রোযাদারের দুআ কবুল হয়। *(প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ করে ইফতারীর সময় দুআ কবুল হওয়ার হাদীস সহীহ নয়। -সম্পাদক)* অবশ্য দুআ কবুল হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হল, সেই সব আদবসমূহ ও শর্তাবলীর খেয়াল রাখা, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এই শর্তাবলীর দু'টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। এক ঃ আল্লাহর উপর সত্যিকারের ঈমান রাখা এবং দুই ঃ তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। অনুরূপ হাদীসসমূহে হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে এবং কাকুতি-মিনতির প্রতি যত্ন নেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে।

(৫১) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দেশ এ রকম ছিল যে, রোযার ইফতারী করার পর থেকে এশার নামায অথবা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রীর-সহবাস করার অনুমতি ছিল। ঘুমিয়ে গেলে এগুলোর কোনটাই করা যেত না। পরিষ্কার কথা যে, মুসলিমদের জন্য এই বাধ্য-বাধকতা বড়ই কঠিন ছিল এবং এর উপর আমলও বড় কষ্টকর ছিল। মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে এই দু'টি নিষেধাজ্ঞাই উঠিয়ে নিয়ে ইফতারী থেকে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দান করলেন। الرَّفَث এর অর্থ, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। الخيط الأبيض (সাদা সুতা বা ভোরের সাদা রেখা)এর অর্থ, সুবহে সাদেক্ব এবং الخيط الأسود (কাল সুতা বা রেখা)এর অর্থ, রাত। *(ইবনে কাসীর)*

মাসআলা ঃ এ থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় রোযা রাখা যায়। কেননা, ফজর পর্যন্ত মহান আল্লাহ সহবাস ইত্যাদির অনুমতি দিয়েছেন এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন হয়। *(ইবনে কাসীর)*

(৫২) অর্থাৎ, রাত (শুরু) হওয়ার সাথে সাথেই (সূর্যাস্তের পর পরই) ইফতারী ক'রে নাও, দেরী করো না। হাদীসেও রোযা তাড়াতাড়ি ইফতারী করার তাকীদ ও ফযীলতের কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, 'বিসাল' (একটানা রোযা) করো না। অর্থাৎ, একদিন রোযা রেখে ইফতারী না ক'রে (এবং সেহরীও না খেয়ে) পরের দিনও রোযা রেখো না। নবী করীম ﷺ এ রোযা রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। *(হাদীস গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য)*

(৫৩) ই'তিক্বাফ অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম ও তার সাথে কোন প্রকার যৌনাচার করার অনুমতি নেই। হ্যাঁ, দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা জায়েয। [عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ] থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ই'তিক্বাফের জন্য মসজিদে অবস্থান জরুরী। তাতে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা। নবী করীম ﷺ-এর পবিত্রা স্ত্রীগণও মসজিদে ই'তিক্বাফ করতেন। কাজেই মহিলাদের নিজেদের ঘরে ই'তিক্বাফে বসা ঠিক নয়। অবশ্য মসজিদে তাদের জন্য পুরুষ থেকে পৃথকভাবে প্রত্যেক জিনিসের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। যাতে

الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

সুতরাং এর ধারে-পাশে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

(১৮৮) তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না।[৫৪]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

(১৮৯) লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে) বল, তা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়; কিন্তু পুণ্যের কাজ হল সংযম অবলম্বন ক'রে চলা। অতএব তোমরা দরজাসমূহ দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর[৫৫] এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

(১৯০) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না,[৫৬] নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ

(১৯১) আর যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার কর। ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর।[৫৭] আর মাসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের)

পুরুষদের সাথে কোন প্রকারের মেলামেশা না ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে উপযুক্ত ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে মসজিদে ই'তিক্বাফে বসতে না দেওয়াই উচিত হবে এবং মহিলাদেরও উচিত, তারা যেন এ ব্যাপারে জেদ না ধরে। এটা কেবল একটি নফল ইবাদত, তাই সম্পূর্ণরূপে হেফাযতের ব্যবস্থা না থাকলে এই নফল ইবাদত ত্যাগ করাই ভাল। ফিক্বহের মূল নীতি হল, 'কল্যাণ আনয়নের উপর অকল্যাণ নিবারণকে প্রাধান্য দিতে হবে।'

(৫৪) এখানে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যার কাছে অপরের কোন প্রাপ্য থাকে, কিন্তু প্রাপকের নিকট তার প্রাপ্য অধিকারের কোন প্রমাণ থাকে না, ফলে এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে সে আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচারকের মাধ্যমে নিজের পক্ষে ফায়সালা করিয়ে নেয় এবং এইভাবে সে প্রাপকের অধিকার হরণ ক'রে নেয়। এটা যুলুম ও হারাম। আদালতের ফায়সালা যুলুম ও হারামকে বৈধ ও হালাল করতে পারবে না। এই অত্যাচারী আল্লাহর নিকট অপরাধী বিবেচিত হবে। *(ইবনে কাসীর)*

(৫৫) আনসার এবং অন্যান্য আরবরা জাহেলী যুগে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেওয়ার পর যদি পুনরায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে আসার দরকার হত, তাহলে তারা বাড়ির দরজা দিয়ে আসার পরিবর্তে পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল টপকে ভিতরে আসত এবং এটাকে তারা নেকী বা পুণ্যের কাজ মনে করত। মহান আল্লাহ বললেন, এটা নেকী বা পুণ্যের কাজ নয়। *(আইসারুত্ তাফাসীর)*

(৫৬) এই আয়াতে প্রথমবার সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। আর 'বাড়াবাড়ি করো না'র অর্থ হল, শত্রুর আঙ্গিক বিকৃতি ঘটায়ো না, মহিলা, শিশু এবং এমন বৃদ্ধকে হত্যা করো না, যে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেনি। অনুরূপ গাছ-পালা বা ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং কোন অভীষ্ট লাভ ছাড়াই পশু-হত্যা করা ইত্যাদিও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হবে। *(ইবনে কাসীর)*

(৫৭) মক্কায় মুসলিমরা যেহেতু দুর্বল ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা নিষেধ ছিল। হিজরতের পর মুসলিমদের সমস্ত শক্তি মদীনায় একত্রিত হলে তাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে তিনি কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন, যারা অগ্রিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসত। এরপর এটাকে আরো সম্প্রসারিত করা হয় এবং মুসলিমরা প্রয়োজন অনুযায়ী কাফেরদের অঞ্চলে গিয়েও জিহাদ করেন। কুরআন কারীমে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই জন্য নবী করীম ﷺ স্বীয় সৈন্যদের তাকীদ করতেন যে, খিয়ানত ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। আঙ্গিক বিকৃতি ঘটায়ো না। শিশু, মহিলা এবং গির্জায় উপাসনায় মগ্ন উপাসক বা পুরোহিতদেরকে হত্যা করো না। অনুরূপ বৃক্ষাদি জ্বালাবে না এবং বিনা উদ্দেশ্যে পশুদের হত্যা করবে না। *(ইবনে কাসীর-মুসলিম ইত্যাদি)* [حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ] "যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা কর" এর অর্থ হল, যখনই তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, তখনই তাদেরকে হত্যা কর। *(আইসারুত্তাফাসীর)* [مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ] অর্থাৎ, যেভাবে কাফেররা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করেছিল, সেভাবে তোমরাও তাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার কর। তাইতো মক্কা বিজয়ের দিন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, চুক্তির সময় সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)

নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না; যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের হত্যা কর।[৫৮] এটাই তো অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)

(১৯২) কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لله فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

(১৯৩) আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া (অন্য কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

(১৯৪) নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস এবং সকল নিষিদ্ধ (পবিত্র) জিনিসের জন্য এরূপ বিনিময়।[৫৯] সুতরাং যে তোমাদেরকে (ঐ মাসে) আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ (মাসে) আক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী।

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

(১৯৫) তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং (ব্যয় না ক'রে) নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না।[৬০] আর তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ

(১৯৬) আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর,[৬১] কিন্তু (ইহরাম বাঁধার পর) যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে সহজলভ্য (পশু) কুরবানী কর[৬২] এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো না)।[৬৩] অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার

বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। 'ফিৎনা'র অর্থ, কুফ্‌রী ও শির্ক। এটা হত্যার চেয়েও কঠিন (বড় অপরাধ)। তাই এর মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

(৫৮) 'হারাম' সীমানায় যুদ্ধ করা নিষেধ। কিন্তু কাফেররা যদি 'হারাম'-এর মর্যাদার খেয়াল না রাখে, তাহলে তোমাদেরও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে।

(৫৯) হিজরী সনের ৬ষ্ঠ বছরে যুলহজ্জ মাসে রসূল ﷺ চৌদ্দশ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে উমরাহ করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিল এবং আপোসে ফায়সালা এই হল যে, আগামী বছর মুসলিমরা তিন দিনের জন্য উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। মাসটা ছিল 'হারাম' (যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ) মাসসমূহের একটি মাস। পরের বছরে চুক্তি অনুযায়ী মুসলিমরা যখন উক্ত মাসেই উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উদ্দেশ্য এই যে, এবারও যদি মক্কার কাফেররা এই মাসের সম্মান রক্ষা না ক'রে (গতবারের মত) তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তবে তোমরাও এর মর্যাদার কোন খেয়াল না ক'রে তাদের সাথে পূর্ণ উদ্যমে মোকাবেলা কর। 'সকল নিষিদ্ধ (পবিত্র) জিনিসের জন্য এরূপ বিনিময়' অর্থাৎ, তারা যদি নিষিদ্ধ মাসের সম্মান রক্ষা করে, তাহলে তোমরাও তার সম্মান রক্ষা কর। অন্যথা তোমরাও এই সম্মানকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে কাফেরদেরকে উপদেশমূলক শিক্ষা দাও। *(ইবনে কাসীর)*

(৬০) কারো নিকট এর অর্থ হল, (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা। কেউ বলেছেন, জিহাদ না করা। আবার কেউ বলেছেন, অব্যাহতভাবে পাপ করা। আর এ সবগুলোই ধ্বংস ডেকে আনে। যদি জিহাদ ত্যাগ কর অথবা জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকো, তাহলে শত্রুরা শক্তিশালী হবে এবং তোমরা হবে দুর্বল, ফলে ধ্বংস হতে হবে।

(৬১) হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে নেওয়ার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা (হজ্জ ও উমরাহ) নফল হয়। *(আইসারুত তাফাসীর)*

(৬২) অর্থাৎ, যদি পথে শত্রু অথবা কঠিন অসুস্থতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে একটি পশু, উট অথবা গরু (গোটা অথবা এক সপ্তমাংশ) অথবা ছাগল বা ভেড়া সেখানেই যবেহ ক'রে মাথা নেড়া ক'রে হালাল হয়ে যাও। যেমন, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ হুদাইবিয়্যাতে কুরবানী যবেহ করেছিলেন। আর হুদাইবিয়্যা হারাম সীমানার বাইরে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* অতঃপর আগামী বছরে তার কাযা কর। যেমন, নবী করীম ﷺ সন ৬ হিজরীর উমরার কাযা সন ৭ হিজরীতে করেছিলেন।

(৬৩) এর সংযোগ [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ] (আর তোমরা হজ্জ--- সম্পাদন কর)এর সাথে। আর এর সম্পর্ক হল নিরাপদ পরিস্থিতির সাথে। অর্থাৎ, নিরাপদ অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা নেড়া করবে না (ইহরাম খুলে হালাল হবে না), যতক্ষণ না হজ্জের সমস্ত কার্যাদি পূরণ করেছ।

أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে তার পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্‌ইয়া (বিনিময়) দেবে।[৬৪] অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানী না পায় (বা দিতে অক্ষম হয়), তাহলে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন[৬৫] -- এই পূর্ণ দশ দিন রোযা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে (মক্কায়) বাস করে না।[৬৬] আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي

(১৯৭) সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়।[৬৭] সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে।[৬৮] তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।[৬৯] হে

---

(৬৪) অর্থাৎ, সে যদি এমন কষ্টে পতিত হয়ে পড়ে যে, তাকে মাথার চুল কাটতেই হবে, তাহলে তাকে ফিদ্‌ইয়া (বিনিময়) অবশ্যই দিতে হবে। হাদীস অনুযায়ী এ রকম (অসুবিধাগ্রস্ত) ব্যক্তি ছ'জন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে কিংবা তিন দিন রোযা রাখবে। রোযা ব্যতীত অন্য দু'টি ফিদ্‌ইয়ার স্থানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, খাদ্য দান ও ছাগল যবেহ করার কাজ মক্কাতে করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, রোযার মতই এর জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। ইমাম শাওকানী এই মতেরই সমর্থন করেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৬৫) হজ্জ তিন প্রকার; ইফরাদ ঃ কেবল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। ক্বিরান ঃ হজ্জ ও উমরার এক সাথে নিয়ত ক'রে ইহরাম বাঁধা। এই উভয় অবস্থায় হজ্জের সমস্ত কার্যাদি সুসম্পন্ন না ক'রে ইহরাম খোলা বৈধ নয়। তামাত্তু' ঃ এতেও হজ্জ ও উমরার নিয়ত হয়। তবে প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং উমরাহ সম্পূর্ণ ক'রে ইহরাম খুলে দেওয়া হয় এবং যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারীখে হজ্জের জন্য মক্কা থেকেই দ্বিতীয়বার ইহরাম বাঁধা হয়। 'তামাত্তু'র অর্থ লাভবান হওয়া। অর্থাৎ, উমরাহ ও হজ্জের মাঝে ইহরাম খুলে লাভবান হওয়া হয়। হজ্জে ক্বিরান এবং হজ্জে তামাত্তু'তে একটি হাদ্‌ই (অর্থাৎ, একটি ছাগল বা ভেড়া কিংবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ) কুরবানী দিতে হবে। যদি কেউ কুরবানী দিতে না পারে, তাহলে সে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনগুলোতে যে রোযা রাখবে, তা হয় ৯ই যুল-হজ্জের (আরাফার দিনের) আগে রাখবে অথবা তাশরীকের দিনগুলোতে রাখবে।

(৬৬) অর্থাৎ, তামাত্তু' হজ্জ ও কুরবানী বা রোযা রাখা কেবল তাদের জন্য বিধেয়, যারা মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। অর্থাৎ, হারাম সীমানার অথবা তার এত কাছের বাসিন্দা নয় যে, তাদের সফরে নামায কসর করা যায়। *(ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর)*

(৬৭) আর তা হল, শাওয়াল, যুল-ক্বা'দাহ এবং যুল-হাজ্জাহ মাসের প্রথম তেরো দিন। অর্থাৎ, উমরাহ তো বছরে সব সময় জায়েয, কিন্তু হজ্জ কেবল নির্দিষ্ট দিনে হয়, তাই হজ্জের ইহরাম হজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে বাঁধা বৈধ নয়। *(ইবনে কাসীর)*

মাসআলা ঃ হজ্জে ক্বিরান অথবা ইফরাদের ইহরাম মক্কাবাসীরা মক্কার ভিতর থেকেই বাঁধবে। তবে হজ্জে তামাত্তু'র উদ্দেশ্যে উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য হারাম সীমানার বাইরে যাওয়া অত্যাবশ্যক। *(ফাতহুল বারী, হজ্জ অধ্যায় ঃ উমরাহ পরিচ্ছেদ, মুঅত্তা ইমাম মালিক)* অনুরূপ দুনিয়ার অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকেরা ৮ই যুলহজ্জ হজ্জে তামাত্তু'র জন্য মক্কা (নিজের বাসা) থেকেই ইহরাম বাঁধবে। আবার কোন কোন আলেমের নিকট মক্কাবাসীদেরকে উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য হারাম সীমানার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তারা সর্বপ্রকারের হজ্জ এবং উমরার জন্য নিজ নিজ স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারে।

সতর্কতা ঃ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যেম লিখেছেন যে, রসূল ﷺ-এর কথা ও কাজ দ্বারা কেবল দু'প্রকারের উমরাহ প্রমাণিত, এক যা হজ্জে তামাত্তু'র সাথে করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় হল, এমন উমরাহ যা হজ্জের মাস ব্যতীত অন্য দিনে কেবল উমরাহ করার নিয়তে সফর ক'রে করা হয়। এ ছাড়া হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে (হারামের নিকটস্থ কোন স্থান থেকে) ইহরাম বেঁধে এসে (একই সফরে একাধিক) উমরা করা বিধেয় নয়। (অবশ্য তার ব্যাপার ভিন্ন, যে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার মত সমস্যায় পড়ে আগে উমরাহ না করতে পারবে।) *(যাদুল মাআ'দ ২খন্ড নতুন ছাপা)*

(৬৮) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করে এবং অশ্লীল ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে ব্যক্তি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে বেড়িয়ে আসে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নবজাত শিশুরূপে প্রসব করছে।" *(বুখারী ১৮১৯-মুসলিম ১৩৫০)*

(৬৯) এখানে 'তাক্বওয়া' বা আত্মসংযমের অর্থ ঃ চাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। অনেক মানুষ হজ্জের পাথেয় না নিয়েই বাড়ী থেকে বের হত এবং বলত যে, আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা আছে। (অতঃপর তারা লোকের কাছে ভিক্ষা করত।) মহান আল্লাহ

জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (١٩٧)

(১৯৮) (হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই।[৭০] যখন তোমরা আরাফাত (প্রান্তর) হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ কর; যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[৭১] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ(١٩٨)

(১৯৯) অতঃপর (কুরাইশের মত আরাফাত না গিয়েই কেবল মুযদালিফা থেকে না ফিরে অন্য) লোকেরা যেখান থেকে ফিরে, সেখান থেকেই (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়) ফিরে চল।[৭২] আর আল্লাহর কাছে মার্জনা চাও; বস্তুতঃ আল্লাহ চরম মার্জনাকারী, পরম দয়ালু। ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

(২০০) অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন (মিনায়) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন (জাহেলী যুগে) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।[৭৩] এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।' বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (٢٠٠)

(২০১) পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর[৭৪] এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

(২০২) তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ

'তাওয়াক্কুল' বা ভরসার ঐ অর্থকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে পাথেয় নেওয়ার উপর তাকীদ করলেন।

(৭০) فَضل (অনুগ্রহ)এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য। অর্থাৎ, হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করাতে কোন দোষ নেই। (অবশ্য আসল উদ্দেশ্য হজ্জই হতে হবে; ব্যবসা যেন আসল উদ্দেশ্য না হয়; তাহলে হজ্জ হবে না।)

(৭১) ৯ই যুলহজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ রুকন্ (অঙ্গ)। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "আরাফায় অবস্থানই হল হজ্জ।" এখানে মাগরিবের নামায পড়া হবে না, বরং মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিবের তিন রাকআত এবং এশার দু' রাকআত (কসর ক'রে) এক সাথে জমা ক'রে একবার আযান ও দু'বার ইক্বামত দিয়ে পড়তে হবে। মুযদালিফাকেই 'মাশআরে হারাম' বলা হয়। কেননা, এটা হারামেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে হাজীদেরকে আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি যত্ন নিতে বলা হয়েছে। এখানে রাত্রিবাস করতে হয়। ফজরের নামায 'গালাস' (অন্ধকারে) অর্থাৎ, প্রথম অক্তে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্‌রে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে যাত্রা করতে হয়।

(৭২) উল্লিখিত ক্রমানুসারে আরাফায় যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান ক'রে ফিরে আসা জরুরী। কিন্তু আরাফা যেহেতু হারামের বাইরে তাই মক্কার কুরাইশরা আরাফা পর্যন্ত যেতো না, বরং মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসতো। তাই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যেখান থেকে সবাই ফিরে আসে, সেখান থেকে তোমরাও ফিরে এসো। অর্থাৎ, আরাফাত থেকে।

(৭৩) আরবের লোক হজ্জ সমাপ্ত ক'রে মিনায় মেলা বসাতো এবং পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব স্মরণ করত। মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে, ১০ই যুলহজ্জ কাঁকর মেরে, মাথা নেড়া ক'রে এবং কা'বার তাওয়াফ ও স্বাফা-মারওয়ার সাঈ ক'রে হজ্জ সমাপ্ত ক'রে নেওয়ার পর তোমরা যে তিনদিন মিনায় অবস্থান করবে, সে দিনগুলিতে সেখানে খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র কর। যেমন, জাহেলী যুগে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে।

(৭৪) অর্থাৎ, ভাল কাজ করার তাওফীক্ব দান কর। অর্থাৎ, ঈমানদাররা দুনিয়াতেও দুনিয়া চায় না, বরং নেকীর কাজের তাওফীক্ব কামনা করে। নবী করীম ﷺ খুব বেশী বেশী এই দুআটি পড়তেন। তাওয়াফ করাকালীন অনেক লোকে প্রত্যেক চক্করে পৃথক পৃথক দুআ পড়ে থাকে, যা মনগড়া দুআ। এই দুআগুলোর পরিবর্তে তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে 'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়া হাসানাহ---' পড়া সুন্নত। *(প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য আয়াতে 'ইহকালের কল্যাণ'-এর তাৎপর্যে একাধিক তফসীর বর্ণিত হয়েছে; যেমন ঃ পুণ্যময়ী স্ত্রী, ইবাদত, ইল্‌ম ও ইবাদত, মাল-ধন, নিরাপত্তা, প্রশস্ত রুযী, নেয়ামত বা সম্পদ ইত্যাদি। সুতরাং এর অর্থ ব্যাপক রাখাই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে পরকালের সাথে ইহকালের সুখ-শান্তি চাওয়াও দোষাবহ নয়। আসলে কিছু লোক কেবল ইহকালের সুখই কামনা করে; কিন্তু মুসলিম কামনা করে ইহ-পরকাল উভয়ের সুখ। -সম্পাদক)*

আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

الْحِسَابِ (٢٠٢)

(২০৩) তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ --এই তিন দিন মীনায় অবস্থান কালে) আল্লাহকে স্মরণ কর,[৭৫] আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি ক'রে দুই দিনেই চলে আসে, তবে তাতে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তবে তারও কোন পাপ নেই।[৭৬] এ (নিয়ম) তার জন্য যে ধর্মভীরু। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে সমবেত করা হবে।

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

(২০৪) মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক।[৭৭]

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)

(২০৫) আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তুর) বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)

(২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে।[৭৮] সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

(২০৭) পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিক্রয় ক'রে দেয়[৭৯] এবং আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

(২০৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।[৮০] নিশ্চয়ই সে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا

([৭৫]) নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বলে তাশরীকের দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যুল-হজ্জের ১১, ১২ এবং ১৩ তারীখ। এই দিনগুলোতে আল্লাহর যিক্‌র, অর্থাৎ, উচ্চৈঃস্বরে তকবীর পড়া সুন্নত। কেবল যে ফরয নামাযের পরই পড়া হবে তা নয়; বরং সব সময় এই তাকবীর 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হাম্‌দ' পড়া বাঞ্ছনীয়। কাঁকর মারার সময় প্রত্যেক কাঁকরের সাথে তাকবীর পড়া সুন্নত। *(নায়লুল আওত্বার ৫/৮৬)*

([৭৬]) রমই জিমার (জামরাতে কাঁকর মারা) তিন দিন উত্তম। কিন্তু কেউ যদি কেবল দু'দিন (১১ ও ১২ই যুলহজ্জ) কাঁকর মেরে মিনা থেকে প্রত্যাগমন করে, তবে তারও অনুমতি আছে।

([৭৭]) কোন কোন দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয় যে, এই আয়াত একজন মুনাফিক্ব আখনাস বিন শুরাইক্ব সাক্বাফীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কিন্তু সঠিকতর কথা এই যে, এই আয়াতের লক্ষ্য হল সেই সমস্ত মুনাফিক্ব এবং অহংকারিগণ, যাদের মধ্যে ক্বুরআনে উল্লিখিত নিকৃষ্ট স্বভাবগুলো পাওয়া যাবে।

([৭৮]) [أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ] "তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে।" এখানে عِـزَّة এর অর্থ ঃ গর্ব-অহঙ্কার, আত্মাভিমান।

([৭৯]) এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, সুহায়ব রূমী ﷺ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা বলল, এই ধন-সম্পদ এখানকারই উপার্জিত, বিধায় আমরা তা সাথে করে নিয়ে যেতে দেবো না। সুহায়ব ﷺ সমস্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ ক'রে দ্বীন নিয়ে রসূল ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর ঘটনা শুনে বললেন, "সুহায়ব অতীব লাভদায়ক ব্যবসা করেছে।" কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু এ আয়াতও ব্যাপক অর্থের, যা সমস্ত মু'মিন, আল্লাহভীরু এবং দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বীনকে প্রাধান্য দানকারী সকলকেই শামিল করে থাকে। কেননা, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে নীতি হল, 'বাচ্যার্থের ব্যাপকতাই লক্ষণীয়, অবতীর্ণের কারণবিষয়ক ঘটনার বিশেষত্ব নয়'। অর্থাৎ, আয়াতের যে অর্থ তার ব্যাপকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকলেও অর্থ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক (যার কথা পূর্বের আয়াতে এসেছে) মন্দ চরিত্রের একটি নমুনা। যারাই এই চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা সকলেই তার শ্রেণীভুক্ত হবে। অনুরূপ যারা উত্তম গুণাবলী এবং পূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁদের সকলের জন্য নমুনা হবেন সুহায়ব ﷺ।

([৮০]) ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে যাও। এমন করো না যে, যে নির্দেশগুলো তোমাদের স্বার্থ ও মনপসন্দ হবে, সেগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো ত্যাগ করবে। অনুরূপ যে দ্বীন

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨)

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩)

(২০৯) অতঃপর প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (٢١٠)

(২১০) তারা কেবল এ প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফিরিশ্তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, অতঃপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।[৮১] আর সব বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(٢١١)

(২১১) বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি।[৮২] আল্লাহর অনুগ্রহ উপস্থিত হবার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে[৮৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

(২১২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)দের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসী (মুমিন)গণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে।[৮৪] অথচ যারা ধর্মভীরু তারা শেষ বিচারের দিন তারা তাদের উর্ধ্বে (বেহেশ্তে) থাকবে । আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (ইহ-পরকালে) অশেষ জীবিকা দান ক'রে থাকেন।[৮৫]

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

(২১৩) মানুষ (আদিতে) ছিল একই জাতিভুক্ত ছিল।[৮৬] (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে

তোমরা ছেড়ে এসেছ, তার কথাও ইসলামে প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা করো না; বরং কেবল ইসলামকেই পূর্ণরূপে বরণ করে নাও। এ আয়াতে দ্বীনের নামে বিদআতেরও খন্ডন করা হয়েছে এবং বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খন্ডন করা হয়েছে, যারা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং দ্বীনকে কেবল (ব্যক্তিগত) ইবাদত অর্থাৎ, মসজিদে সীমাবদ্ধ রেখে রাজনীতি এবং দেশের সংসদ থেকে তাকে নির্বাসন দিতে চায়। এইভাবে জনসাধারণকেও বুঝানো হচ্ছে, যারা প্রচলিত প্রথা ও লোকাচার এবং আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পছন্দ করে, কোন মতেই তারা এগুলোকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়; যেমন মৃত্যু ও বিবাহ-শাদীতে ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক এবং বিজাতীয় রীতিনীতি ইত্যাদির অনুকরণ ক'রে থাকে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যে ইসলাম পরিপন্থী কথা ও কর্মকে লোভনীয় ও শোভনীয় ভঙ্গীতে তোমাদের সামনে পেশ করে, যে মন্দের উপর খুব ভালোর লেবেল চড়ায় এবং বিদআতকেও নেকীর কাজ বলে বুঝায়, যাতে সর্বদা তোমরা তার পাতা জালে ফেঁসে থাকো।

(৮১) এটা হয়তো কিয়ামতের দৃশ্য, যেমন কোন কোন তফসীরের বর্ণনায় এসেছে। *(ইবনে কাসীর)* অর্থাৎ, এরা কি কিয়ামত কায়েম হওয়ার অপেক্ষা করছে? অথবা এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাসহ মেঘের আড়ালে তাদের সামনে এসে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন, তবেই তারা ঈমান আনবে। কিন্তু এ রকম ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে বিলম্ব না ক'রে সত্বর তা স্বীকার ক'রে নিয়ে নিজের পরকাল সুন্দর ক'রে নাও।

(৮২) যেমন, মূসা ﷺ-এর লাঠি। এই লাঠির মাধ্যমে মহান আল্লাহ যাদুকরদেরকে পরাস্ত ও সমুদ্রে পথ তৈরী করেন। পাথর হতে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত করেন। মেঘের ছায়া এবং মান্ন্ ও সালওয়ার অবতারণ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর কুদরত এবং মূসা ﷺ-এর সত্যতারই প্রমাণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর বিধানাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

(৮৩) অনুগ্রহ বা নিয়ামত পরিবর্তন করার অর্থ, ঈমানের পরিবর্তে কুফ্রী ও বিমুখতার পথ অবলম্বন করা।

(৮৪) যেহেতু বেশীরভাগ মুসলিমরা দরিদ্র ছিল, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই কাফেররা অর্থাৎ, মক্কার কুরাইশরা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করত। যেমন, প্রত্যেক যুগের বিত্তশালীদের চিরাচরিত এই একই রীতি।

(৮৫) ঈমানদারদের দরিদ্রতাময় এবং বিলাসবিহীন জীবনের কারণে কাফেররা যে তাদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করত, সে কথা উল্লেখ ক'রে বলা হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন এই দরিদ্র মানুষগুলো তাদের আল্লাহভীরুতার গুণে শীর্ষস্থান লাভ করবে। 'অশেষ জীবিকা'র সম্পর্ক আখেরাত ও দুনিয়া দু'টোরই সাথে হতে পারে। কেননা, কয়েক বছরের মধ্যেই মহান আল্লাহ এই দরিদ্র লোকদের জন্য দেশ বিজয়ের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যার ফলে পার্থিব ভোগসামগ্রী ও রুযীর প্রাচুর্য নেমে এসেছিল তাদের জীবনে।

(৮৬) অর্থাৎ, তাওহীদের উপর। আদম ﷺ থেকে নূহ ﷺ পর্যন্ত দশ শতাব্দী অবধি যে তাওহীদের শিক্ষা নবীরা দিয়েছেন, সেই তাওহীদের উপরেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে মুফাস্সির সাহাবাগণ فَاخْتَلَفُوْا বাক্য উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ, এরপর শয়তানের চক্রান্তে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং শির্ক ও কবরপূজা ব্যাপক হয়ে গেল। فَبَعَثَ এর সংযোগ فَاخْتَلَفُوْا এর সাথে। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ নবীদেরকে কিতাবসহ প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা তাদের মধ্যেকার মতভেদের ফায়সালা করেন এবং সত্য ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করেন। *(ইবনে কাসীর)*

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٢١٣)

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, আসলে যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারাই শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতভেদ সৃষ্টি করেছিল।[৮৭] অতঃপর তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সত্য-পথে পরিচালিত করেন।[৮৮] আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত ক'রে থাকেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ (٢١٤)

(২১৪) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি?[৮৯] দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।[৯০]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(২১৫) তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, 'তারা কি জিনিস দান করবে?' বল, 'তোমরা যে ধন খরচ কর, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন (এতীম), অভাবগ্রস্ত (মিসকীন) এবং (দুর্দশাগ্রস্ত) মুসাফিরদের জন্য।[৯১] আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন,

---

([৮৭]) মতভেদ সব সময় সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই হয়। আর এই বিচ্যুতির উৎপত্তি হয় শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যতদিন পর্যন্ত বিচ্যুতি ছিল না, ততদিন পর্যন্ত এই উম্মাহ তার মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মতভেদের বিভীষিকা থেকে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ এবং বিদআত সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার যে পথ বের করল, সেই পথের কারণে মতভেদের গন্ডি প্রসার লাভ করল এবং তা বাড়তেই থাকল। বর্তমানে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একটি অসম্ভব বিষয়রূপে পরিণত হয়েছে! সুতরাং আল্লাহই মুসলিমদেরকে সুপথ দেখান। আমীন।

([৮৮]) যেমন ঃ আহলে-কিতাব তথা কিতাবধারীরা জুমআর ব্যাপারে মতভেদ করল। ইয়াহুদীরা শনিবারের দিনকে এবং খ্রিষ্টানরা রবিবারের দিনকে তাদের পবিত্র দিন হিসেবে নির্বাচিত করল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে জুমআর দিনটা নির্বাচন করার নির্দেশ দিলেন। তারা ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে বিরোধিতা করল। ইয়াহুদীরা তাঁকে মিথ্যা জানল এবং (অবৈধ সন্তান বলে) তাঁর মাতা মারিয়াম (আলাইহাস্ সালাম)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিল। এদিকে খ্রিষ্টানরা তাদের (ইয়াহুদীদের) বিপরীত ক'রে তাঁকে (ঈসাকে) আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাঁর ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক্ব দিলেন; তিনি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর অনুগত বান্দা ছিলেন। ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারেও তারা মতভেদ ক'রে একদল তাঁকে ইয়াহুদী এবং অপর দল তাঁকে খ্রিষ্টান বলল। মুসলিমদেরকে আল্লাহ সঠিক কথা জানিয়ে দিলেন যে, "তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন।" এইভাবে অনেক বিষয়ে মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে মুসলিমদেরকে সরল ও সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

([৮৯]) মদীনায় হিজরত করার পর মুসলিমরা যখন ইয়াহুদী, মুনাফিক্ব এবং আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পীড়া ও কষ্ট পেতে লাগল, তখন কোন কোন মুসলিম নবী করীম ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করল। তাই মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাযিল হল এবং রসূল ﷺও বললেন যে, "তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরা হত এবং লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁদের গোশ্ত ও চামড়াকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হত। কিন্তু এই অকথ্য যুলুম-নির্যাতন তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি।" অতঃপর বললেন, "আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ এই দ্বীনকে এমনভাবে জয়যুক্ত করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামানের) সানআ' থেকে হাযরে-মাউত পর্যন্ত একা সফর করবে, তার মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভয় থাকবে না।" *(সহীহ বুখারী ৩৬১২নং)* এ থেকে নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য, মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা ও অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা।

([৯০]) এই জন্যই বলা হয়, 'যা আসবেই, তা আসন্ন'। আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সাহায্য যেহেতু সুনিশ্চিত তাই তা নিকটেই।

([৯১]) কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম ﷺদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে মাল খরচ করার প্রাথমিক পর্যায়ের খাত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, এরা তোমার আর্থিক সাহায্যের সবার চাইতে বেশী অধিকারী। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খরচ করার এ নির্দেশ নফল সাদক্বা সম্পর্কীয়; যাকাত সম্পর্কীয় নয়। কারণ, পিতা-মাতার উপর যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। মায়মূন বিন মিহরান এই আয়াত তেলাঅত ক'রে বললেন, 'যে পথসমূহে মাল ব্যয় করার কথা এসেছে, তাতে না ঢোল-তবলার উল্লেখ আছে, না বাঁশীর উল্লেখ আছে, আর না কাঠের পুতুলের উল্লেখ আছে আর না এমন পর্দার, যা দেওয়ালে টাঙানো হয়। অর্থাৎ, এ সব জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করা অপছন্দনীয় ও অপচয়মূলক কাজ। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যে, ইদানীং এই অপচয়মূলক ও অপছন্দনীয়

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।’

كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

(২১৬) তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৯২]

يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

(২১৭) পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারাম (কা’বা শরীফের পাশে উপাসনায়) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। আর হত্যা অপেক্ষা ফিতনা (শির্ক) ভীষণতর অন্যায়।[৯৩] যদি তারা সক্ষম হয়, তাহলে যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে না দেয়, সে পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে।[৯৪] পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রূপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৯৫]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨)

(২১৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে (ধর্মের জন্য) হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করে ও জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল,

---

খরচ আমাদের জীবনের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এতে অপছন্দনীয়তার কোন দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

(৯২) জিহাদের নির্দেশের একটি উপমা পেশ ক’রে ঈমানদারদের বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল কর, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় ও ভারী মনে হয়। কারণ, এর পরিণাম ও ফলসমূহ কেবল আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। হতে পারে এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন, জিহাদের ফলস্বরূপ তোমরা লাভ করবে বিজয়, সাফল্য, মর্যাদা-সম্মান এবং শীর্ষস্থান ও (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ-সামগ্রী। পক্ষান্তরে তোমরা যেটা পছন্দ কর (অর্থাৎ, জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা), তার ফল তোমাদের জন্য অতীব বিপজ্জনক হতে পারে। অর্থাৎ, শত্রু তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে হবে।

(৯৩) রজব, যুলক্বা’দাহ, যুলহাজ্জাহ এবং মুহার্রাম এই চারটি মাস জাহেলিয়াতের যুগেও ‘হারাম’ (পবিত্র, নিষিদ্ধ বা সম্মানীয়) মাস মনে করা হত। এ মাসগুলোতে লড়াই-যুদ্ধ অপছন্দনীয় ছিল। ইসলামও সেই সম্মানকে বজায় রাখল। নবী করীম ﷺ-এর যামানায় এক মুসলিম সৈন্যদলের হাতে একজন কাফের নিহত হয় এবং কিছু লোককে বন্দী করা হয়। মুসলিম এই দলটি অবগত ছিল না যে, রজব মাস শুরু হয়ে গেছে। কাফেররা মুসলিমদেরকে গঞ্জনা দিতে লাগল যে, হারাম মাসের সম্মানেরও এরা খেয়াল করে না। এই ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয় যে, অবশ্যই হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু হারামের দোহাইদাতাদের নিজেদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না? এরা তো এর (যুদ্ধের) থেকেও বড় অপরাধে অপরাধী। এরা আল্লাহর পথ ও মসজিদে হারাম থেকে লোকদেরকে বাধা দেয় এবং সেখান থেকে মুসলিমদেরকে বাহির হতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও কুফ্‌রী ও শির্ক তো হত্যার চেয়েও বড় পাপ। কাজেই ভুলবশতঃ যদি এক-আধটা হত্যা হারাম মাসে মুসলিমদের দ্বারা হয়েই থাকে, তাতে কি এমন হয়েছে? এ নিয়ে হাঙ্গামা করার পরিবর্তে তাদেরকে নিজেদের কু-কর্মসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত।

(৯৪) তারা যখন নিজেদের অপকর্ম, চক্রান্ত এবং তোমাদেরকে মুর্তাদ্দ করার (দ্বীন থেকে ফেরানোর) প্রচেষ্টা থেকে ফিরে আসার পাত্র নয়, তখন হারাম মাসের কারণে তোমরা তাদের সাথে মোকাবেলা করা থেকে কেনই বা বিরত থাকবে?

(৯৫) যে দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, অর্থাৎ মুর্তাদ্দ হয়ে যাবে, (তওবা না করলে) তার পার্থিব শাস্তি হল হত্যা। হাদীসে আছে, “যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে, তাকে হত্যা করে দাও।” *(বুখারী ৩০১৭নং)* আর আয়াতে তার পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কৃত নেক আমলসমূহও কুফ্‌রী করা ও দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে মূল্যহীন হয়ে যায় এবং যেভাবে ঈমান আনার পর মানুষের বিগত পাপ মার্জিত হয়ে যায়, অনুরূপ কুফ্‌রী করা ও মুর্তাদ্দ হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যায়। তবে কুরআনের বাগ্‌ধারা থেকে ফুটে উঠে যে, তার আমল বরবাদ তখনই হবে, যখন তার মৃত্যু হবে কুফ্‌রীর উপরে। পক্ষান্তরে যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নেয়, তাহলে এ রকম হবে না। অর্থাৎ, মুর্তাদ্দের তওবা গৃহীত হয়।

পরমদয়ালু।

يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ(٢١٩)

(২১৯) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ[৯৬] এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।'[৯৭] লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, '(আল্লাহর পথে) তারা কী খরচ করবে?' বল, 'যা উদ্বৃত্ত।'[৯৮] এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর --

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(٢٢٠)

(২২০) ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে;[৯৯] বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন।[১০০] নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى

(২২১) অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।[১০১] অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী

---

(৯৬) দ্বীনের দৃষ্টিতে এটা মহাপাপ। (যেহেতু এর ফলে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, গালাগালি ও অশ্লীলতার সৃষ্টি হয়। ইবাদতে বাধা সৃষ্টি হয়, অর্থের অপচয় ঘটে এবং বিদ্বেষ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার আগমন ঘটে।)

(৯৭) উপকারিতাসমূহের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। যেমন, মদপানে সময়িকভাবে শারীরিক স্ফূর্তি, সানন্দ উদ্যম এবং কারো কারো মস্তিষ্কে তেজস্বিতাও আসে। যৌনশক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। তাই তার ব্যবহার ব্যাপক হয়। অনুরূপ এর (মদের) ক্রয়-বিক্রয় বড় লাভদায়ক ব্যবসা। জুয়াতেও কখনো কখনো কেউ জিতে যায়, ফলে সে কিছু অর্থ লাভ করে। কিন্তু এই সমূহ উপকারিতা সেই সমূহ ক্ষতি ও ফাসাদের তুলনায় কিছুই নয়; যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও তার দ্বীন-ধর্মের উপর আসে। আর এই জন্যই বলা হয়েছে, "কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" এই আয়াতে মদ ও জুয়াকে (পরিষ্কারভাবে) হারাম বলা না হলেও তার প্রাথমিক সূচনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই জানা যায় যে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু লাভ থাকেই, তাতে তা যতই খারাপ জিনিস হোক না কেন। যেমন রেডিও, টিভি এবং এই ধরনের আরো আবিষ্কৃত আধুনিক জিনিস। মানুষ তার কিছু কিছু লাভের কথা উল্লেখ ক'রে আত্মপ্রতারণা করে থাকে। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, লাভ ও নোকসানের মধ্যে কোন্টার ভাগ বেশী। বিশেষতঃ দ্বীন, ঈমান এবং আখলাক-চরিত্রের দিক দিয়ে। যদি দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তার নোকসান ও ক্ষতির দিক বেশী হয়, তাহলে সামান্য পার্থিব লাভের জন্য তা জায়েয সাব্যস্ত করা যাবে না।

(৯৮) এই অর্থের দিক দিয়ে এটা একটি নৈতিক নির্দেশ অথবা এই নির্দেশ ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ছিল। যাকাত ফরয হওয়ার পর এর উপর আমল আর জরুরী নয়। তবে উত্তম অবশ্যই বটে। কিংবা العَفـــو এর অর্থ হল, "যা সহজভাবে ও অনায়াসে হয় এবং অন্তরে ভারী অনুভূত না হয়।" ইসলাম অবশ্যই (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার প্রতি বড় উৎসাহ প্রদান করেছে, তবে এ ব্যাপারে মধ্যপন্থার খেয়াল রেখে প্রথমতঃ স্বীয় অধীনস্থ ব্যক্তিদের দেখাশোনা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন মুক্তহস্তে ব্যয় করতে নিষেধ করেছে, যাতে কাল তোমাকে ও তোমার পরিবারের লোকদেরকে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়।

(৯৯) অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল ভক্ষণকারীদের প্রতি যখন তিরস্কার নাযিল হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম ﷺ ভয় পেয়ে গেলেন এবং এতীমদের মাল পৃথক করে দিলেন, এমন কি পানাহারের কোন কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেলে তাও এই ভয়ে ব্যবহার করতেন না যে, আমরাও যেন (আল্লাহ কর্তৃক) নাযিলকৃত শাস্তির উপযুক্ত ও তিরস্কারে শামিল না হয়ে যাই, ফলে তা খারাপ হয়ে যেত। এই কারণেই এই আয়াত নাযিল হল। *(ইবনে কাসীর)*

(১০০) অর্থাৎ, উপকারের চেষ্টা ও সৎ উদ্দেশ্যেও তাদের মালকে তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিতেন না।

(১০১) 'অংশীবাদী রমণী' বা মুশরিক নারী বলতে এখানে মূর্তিপূজক নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) নারীদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি কুরআন দিয়েছে। অবশ্য কোন মুসলিম নারীর বিবাহ কোন আহলে কিতাব পুরুষের সাথে হতে পারে না। পরন্তু উমার ﷺ কোন সৎ উদ্দেশ্যেও ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান নারীদের সাথেও বিবাহ পছন্দ করতেন না। *(ইবনে কাসীর)* আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের পরস্পর বিবাহ দেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে এবং দ্বীনকে দৃষ্টিচ্যুত করে কেবল রূপ-সৌন্দর্যের ভিত্তিতে বিবাহ করাকে আখেরাতের জন্য বরবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, "চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয়; মাল, বংশ এবং সৌন্দর্য ও দ্বীনের ভিত্তিতে। তোমরা দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন কর।" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬নং)* অনুরূপ তিনি পুণ্যময়ী সৎশীলা মহিলাকে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পুণ্যময়ী নারী।" *(মুসলিম ১৪৬৭নং)*

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

(২২২) লোকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর[১০২] এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়,[১০৩] তখন তাদের নিকট ঠিক সেই পথে গমন কর, যে পথে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[১০৪] নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

(২২৩) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে (যেদিক থেকে) ইচ্ছা গমন করতে পার।[১০৫] তোমরা তোমাদের (মুক্তির জন্য) পূর্বেই পাথেয় প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হবে এবং বিশ্বাসিগণকে সুসংবাদ দাও।

وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

(২২৪) তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না বলে নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর (নাম)কে

([১০২]) সাবালিকা হওয়ার পর প্রত্যেক নারীর লজ্জাস্থান থেকে মাসে একবার নিয়মিত যে রক্ত আসে, তাকে হায়েয (মাসিক, ঋতু বা রজঃস্রাব) বলা হয়। আবার কখনো কখনো কোন রোগের কারণে বাঁধা নিয়মের অতিরিক্তও আসে; তাকে ইস্তিহাযা বলে। ইস্তিহাযার বিধান হায়েযের থেকে ভিন্ন। মাসিকের দিনগুলোতে নামায মাফ এবং রোযা রাখা নিষেধ। পরে রোযা কাযা করা আবশ্যক। পুরুষের জন্য কেবল সঙ্গম করা নিষেধ, তবে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা জায়েয। অনুরূপ মহিলা এই দিনগুলোতে রান্না সহ সংসারের অন্য সব কাজই করতে পারে। কিন্তু ইয়াহুদীদের মধ্যে এই দিনগুলোতে মহিলাকে সম্পূর্ণ অপবিত্র গণ্য করা হত। তারা তার সাথে মেলামেশা এবং খাওয়া-দাওয়া বৈধ মনে করত না। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে কেবল সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিকটবর্তী না হওয়া বা দূরে থাকার অর্থ ঃ কেবল সঙ্গম করা নিষেধ। *(ইবনে কাসীর ইত্যাদি)*

([১০৩]) 'যখন তারা পবিত্র হয়' এর দু'টি অর্থ বলা হয়েছে। (ক) যখন রক্ত আসা বন্ধ হয়। অর্থাৎ, গোসল ছাড়াই সে পবিত্র হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পুরুষের জন্য তার সাথে (গোসলের পূর্বে) সহবাস করা জায়েয। ইবনে হায্ম এবং অন্য কিছু ইমামগণ এরই সমর্থক। আল্লামা আলবানীও এই মতের সমর্থন করেছেন। *(আদাবুয্ যিফাফ ৪৭ পৃষ্ঠা)* (খ) রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল ক'রে পবিত্র হয়। দ্বিতীয় অর্থানুযায়ী স্ত্রী যতক্ষণ না গোসল করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা হারাম থাকবে। ইমাম শাওকানী এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আমাদের নিকট দু'টোই আমলযোগ্য, তবে দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পাওয়ার অধিক যোগ্য।

([১০৪]) 'যে পথে-- নির্দেশ দিয়েছেন।' অর্থাৎ, যোনিপথে। কারণ, মাসিক অবস্থায় এই যোনিপথই ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই এখন পবিত্র হওয়ার পর যার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেটা এই যোনিপথ ব্যবহার করারই অনুমতি, কোন অন্য পথের নয়। এ থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহিলার পায়ুপথ (মলদ্বার) ব্যবহার করা হারাম। যেমন হাদীসে এ বিষয়কে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

([১০৫]) ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, যদি মহিলাকে উপুড় ক'রে পিছনের দিক থেকে তার সাথে সঙ্গম করা হয়, তাহলে (সেই সঙ্গমে সন্তান জন্ম নিলে) তার চক্ষু টেরা হয়। এই ধারণার খন্ডনে বলা হচ্ছে যে, সহবাস সামনের দিক থেকে কর অথবা পিছনের দিক থেকে কর, যেভাবে ইচ্ছা কর সবই বৈধ। তবে সর্বক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হল নারীর যোনিপথ ব্যবহার করা। কেউ কেউ এ থেকে প্রমাণ করেন যে, 'যেভাবে ইচ্ছা' কথার মধ্যে মলদ্বারও এসে যায়। কাজেই স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহারও বৈধ। কিন্তু এটা একেবারে ভুল কথা। যখন কুরআন মহিলাকে শস্যক্ষেত (সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত) সাব্যস্ত করল, তখন এর পরিষ্কার অর্থ হল, কেবল ক্ষেতকে ব্যবহারের জন্য বলা হচ্ছে যে, "নিজেদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর।" আর এই ক্ষেত (সন্তান জন্মের স্থান) কেবল যোনিপথ, মলদ্বার নয়। মোটকথা, পায়ুমৈথুন একটি রুচি ও প্রকৃতি-বিরোধী কাজ। (তা ছাড়া হাদীসে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করা এক প্রকার কুফরী এবং) যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করে, সে অভিশপ্ত। *(ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)*

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)

লক্ষ্যবস্তু বানায়ো না।[১০৬] আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

لا يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)

(২২৫) তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।[১০৭] কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ (কসম) করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে।[১০৮] অতঃপর তারা যদি (মিলনে) ফিরে আসে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

(২২৭) আর যদি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) সংকল্পবদ্ধ হয়,[১০৯] তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(২২৮) তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন মাসিকস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।[১১০] (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।) তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।[১১১] আর এই সময়ের মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে, তাহলে তাদের স্বামীগণই তাদেরকে পুনঃগ্রহণে অধিক হকদার।[১১২] নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু

([১০৬]) অর্থাৎ, রাগে এই ধরনের কসম খেয়ো না যে, আমি অমুকের সাথে সদ্ব্যবহার করব না, অমুকের সাথে কথা বলব না বা অমুকদের মাঝে মীমাংসা ক'রে দেব না। এই ধরনের কসমের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি ক'রে ফেল, তাহলে তা ভঙ্গ ক'রে দাও এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় কর। (কসমের কাফ্ফারার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ সূরা মায়েদার আয়াত নং ৮৯)

([১০৭]) অর্থাৎ, যে কসম অনিচ্ছায় ও স্বভাবগতভাবে (মুদ্রাদোষে) মুখ থেকে বেড়িয়ে যায়, তার জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কসম রক্ষা করতে হবে। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম খাওয়া মহাপাপ।

([১০৮]) 'ঈলা'র অর্থ কসম খাওয়া। অর্থাৎ, কোন স্বামী যদি কসম খায় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে (উদাহরণস্বরূপ) এক মাস অথবা দু'মাস পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখবে না। অতঃপর কসমের নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ ক'রে সম্পর্ক কায়েম করে নেয়, তাহলে তাতে কোন কাফ্ফারা নেই। কিন্তু যদি নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সম্পর্ক কায়েম করে, তাহলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি চার মাসেরও অধিক সময়ের জন্য কসম খায় কিংবা যদি কোন সময় নির্দিষ্ট না করেই কসম খায়, তাহলে আলোচ্য আয়াতে এই ধরনের লোকদের জন্য সময় নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হয় সে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত করে নেবে, নতুবা তাকে তালাক্ব দিয়ে দেবে। (তাকে চার মাসের অধিক ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি নেই।) প্রথম অবস্থায় তাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি সে উভয় অবস্থার কোনটাই গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আদালত বাধ্য করবে। হয় সে তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করে নেবে অথবা তাকে তালাক্ব দেবে। যাতে মহিলার সাথে কোন প্রকার যুলুম না হয়। *(ইবনে কাসীর)*

([১০৯]) এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাস হয়ে গেলেই আপনা-আপনিই তালাক্ব হয়ে যাবে না। (যেমন কোন কোন উলামার অভিমত।) বরং স্বামী তালাক্ব দিলে তবেই তালাক্ব হবে। আর এ কাজে আদালতও তাকে বাধ্য করবে। অধিকাংশ উলামার এটাই মত। *(ইবনে কাসীর)*

([১১০]) এ থেকে সেই তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে গর্ভবতী নয়। (কারণ, গর্ভবতীর ইদ্দত হল প্রসব হওয়া পর্যন্ত)। অনুরূপ (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বে যে মহিলা তালাক্ব পেয়ে গেছে, সেও নয়। (কারণ, তার কোন ইদ্দত নেই।) যার হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেও নয়। (কেননা, তার ইদ্দত হল, তিন মাস।) অর্থাৎ, এখানে উল্লিখিত নারীগুলো ব্যতীত এমন নারীর ইদ্দতের কথা বলা হচ্ছে, যার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। আর তার ইদ্দত হল, তিন 'ক্বুরূ'। যার অর্থ, তিন পবিত্রাবস্থা অথবা তিন মাসিকাবস্থা। অর্থাৎ, সে তিন পবিত্রাবস্থা বা তিন মাসিকাবস্থা অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ (বিবাহ) করতে পারবে। সালাফগণ 'ক্বুরূ'র উভয় অর্থকেই সঠিক বলেছেন। কাজেই দু'টো অর্থই গ্রহণ করা যায়। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১১১]) এ থেকে মাসিক ও গর্ভ উভয় উদ্দেশ্য। মাসিক গোপন করা বলতে যেমন বলা, তালাক্বের পর আমার একবার বা দু'বার মাসিক এসেছে, অথচ তিন মাসিকই তার এসে গেছে। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া (যদি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে)। আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে, বলা, আমার তিনবারই মাসিক এসে গেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ রকম হয়নি, যাতে স্বামীর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রমাণিত না হয়। অনুরূপভাবে গর্ভ গোপন করাও বৈধ নয়। কেননা, গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে বংশে মিশ্রণ ঘটবে। বীর্য হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে। আর এটা হল খুব বড় পাপ।

([১১২]) ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য যদি স্বামীর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে তার ফিরিয়ে নেওয়ায় সম্পূর্ণ অধিকার আছে। স্ত্রীর অভিভাবকের এ অধিকারে অন্তরায় সৃষ্টি করার অনুমতি নেই।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।[১১৩] আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ(٢٢٩)

(২২৯) এ তালাক দু'বার,[১১৪] অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে[১১৫] অথবা সদ্ভাবে বিদায় দেবে।[১১৬] আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়; তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা ক'রে চলতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা ক'রে চলতে পারবে না, তাহলে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারো কোন পাপ নেই।[১১৭] এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(٢٣٠)

(২৩০) অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে, তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (পুনর্বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য-জীবনে) ফিরে আসায় কোন দোষ নেই।[১১৮] এ সব আল্লাহর

---

(১১৩) অর্থাৎ, উভয়ের অধিকারগুলো একে অপরের মতনই। আর এগুলো আদায় করার ব্যাপারে উভয়েই শরীয়ত কর্তৃক বাধ্য। তবে মহিলাদের উপর পুরুষদের কিছু মর্যাদা বেশী রয়েছে। যেমন, প্রকৃতিগত শক্তি, জিহাদের অনুমতি, দ্বিগুণ মীরাস পাওয়া, অবিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব এবং তালাক্ব দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে।

(১১৪) অর্থাৎ, সেই তালাক্ব, যে তালাক্বে স্বামীর (ইদ্দতের মধ্যে) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে, তার সংখ্যা হল দুই। প্রথমবার তালাক্ব দেওয়ার পর এবং দ্বিতীয়বার তালাক্ব দেওয়ার পরও ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তৃতীয়বার তালাক্ব দেওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি নেই। জাহেলিয়াতে তালাক্বের ও ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সময়-সীমা ছিল না। ফলে নারীর উপর বড়ই যুলুম হত। মানুষ বার বার স্বীয় স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিত। এইভাবে না তাকে নিয়ে সঠিকভাবে সংসার করত, আর না তাকে মুক্ত করত। মহান আল্লাহ এই যুলুমের পথ বন্ধ করে দিলেন। পরন্তু প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। তা না হলে যদি প্রথম তালাক্বেই চির দিনের জন্য বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ থেকে পারিবারিক যে সব সমস্যার সৃষ্টি হত, তা কল্পনাতীত। তাছাড়া মহান আল্লাহ «طَلْقَتَانِ» (দু'তালাক্ব) বলেননি, বরং বলেছেন, «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» (তালাক্ব দু'বার)। এ থেকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক্ব দেওয়া এবং তা কার্যকরী করা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। আল্লাহর হিকমতের দাবী হল, একবার তালাক্ব দেওয়ার পর (তাতে 'তালাক্ব' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) এবং অনুরূপ দ্বিতীয়বার তালাক্ব দেওয়ার পর (তাতে 'তালাক্ব' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার করুক) স্বামীকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃত কর্ম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া। আর এই হিকমত (যৌক্তিকতা) এক মজলিসে তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব গণ্য করার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেওয়া তিন তালাক্বকে কার্যকরী করে দিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করা ও ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে দিলে সেই হিকমত অবশিষ্ট থাকে না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের বইগুলো দ্রষ্টব্য ঃ 'মাজমূআহ মাক্বালাত ইলমিয়াহ'-এক মজলিসে তিন তালাক্ব- এবং 'ইখতিলাফে উম্মাহ আওর সিরাতে মুস্তাক্বীম') এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে, বহু উলামা এক মজলিসে দেওয়া তিন তালাক্বকে কার্যকরী হয়ে যাওয়ার ফতওয়া দিয়ে থাকেন।

(১১৫) অর্থাৎ, তালাক্ব প্রত্যাহার করে নিয়ে তার সাথে ভালভাবে সাংসারিক জীবন-যাপন করবে।

(১১৬) অর্থাৎ, তৃতীয়বার তালাক্ব দেওয়ার পর।

(১১৭) এখানে খুলা' (খোলা তালাক্বের) কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হতে চাইলে, স্বামী তার স্ত্রীকে দেওয়া মোহরানা ফিরিয়ে নিতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে না চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে তালাক্ব দেওয়ার নির্দেশ দেবে। এতেও যদি সে না মানে, তবে আদালত তাদের বিবাহ বানচাল ঘোষণা করবে। অর্থাৎ, খুলা' তালাক্বের মাধ্যমেও হতে পারে এবং বিবাহ বানচালের মাধ্যমেও হতে পারে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর ইদ্দত কেবল এক মাসিক। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম, ফাতহুল ক্বাদীর)* মহিলাকে এই অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে এ কথার উপরেও শক্ত তাকীদ করা হয়েছে যে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে যেন তার স্বামীর কাছে তালাক্ব কামনা না করে। যদি সে এ রকম (অকারণে তালাক্ব কামনা) করে, তাহলে নবী করীম ﷺ এই ধরনের নারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা ক'রে বলেছেন যে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। *(ইবনে কাসীর ইত্যাদি)*

(১১৮) এই তালাক্ব থেকে তৃতীয় তালাক্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তৃতীয় তালাক্ব দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে না ফিরিয়ে নিতে

নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

(২৩১) যখনই তোমরা স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা 'ইদ্দত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে বিধিমতে বহাল কর অথবা সদ্ভাবে বিদায় দাও।[১১৯] তাদের প্রতি নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক ক'রে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করে, সে নিজের ক্ষতি করে এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না।[১২০] তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও কিতাব এবং বিজ্ঞান যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ

(২৩২) আর তোমরা যখন স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পুনর্বিবাহ করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না।[১২১] এতদ্বারা

পারবে, আর না পুনর্বিবাহ করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, এই মহিলার যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক্ব দেয় অথবা সে (স্বামী) যদি মারা যায়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে পুনর্বিবাহ করা জায়েয হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের দেশে যে হালালা (হীলা) প্রথা চালু আছে, তা একটি অভিশপ্ত কর্মকান্ড। নবী করীম ﷺ যে হালালা করে এবং যে করায় তাদের উভয়কেই অভিশাপ করেছেন। হালালা করানোর উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহ, প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নয়, বরং তা ব্যভিচার। এই (অবৈধ পরিকল্পিত) বিবাহের মাধ্যমে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না।

(১১৯) «الطلاق مرتان» এ বলা হয়েছিল যে, দু'বার তালাক্ব পর্যন্ত ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ফিরিয়ে নেওয়া ইদ্দতের মধ্যে হতে পারে। ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নয়। অতএব এখানে একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়নি, যেমন বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়।

(১২০) কেউ কেউ ঠাট্টাচ্ছলে তালাক্ব দিয়ে অথবা বিবাহ ক'রে কিংবা ক্রীতদাস স্বাধীন ক'রে দিয়ে বলে যে, আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম। মহান আল্লাহ এটাকে তাঁর আয়াতের সাথে ঠাট্টা বলে গণ্য করেছেন। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, এ রকম কার্যকলাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। এই জন্য নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, ঠাট্টাচ্ছলেও কেউ যদি উল্লিখিত কাজগুলো ক'রে বসে, তাহলে তা বাস্তবই গণ্য হবে এবং ঠাট্টাচ্ছলে তালাক্ব দিলে অথবা বিবাহ করলে বা স্বাধীন করলে তা কার্যকরী হয়ে যাবে। *(ইবনে কাসীর)*

(১২১) এখানে তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলার ব্যাপারে তৃতীয় একটি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তারা (প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক্বের পর) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে তাতে বাধা দিও না। নবী করীম ﷺ-এর যামানায় এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। মহিলার ভাই বিবাহে বাধা দিয়েছিল। যার ফলে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুন্নিকাহ, পরিচ্ছেদঃ অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না)* এখানে একটি কথা এও জানা গেল যে, মহিলা নিজে-নিজে বিবাহ করতে পারে না, বরং তার বিবাহের জন্য অলী (অভিভাবকে)র অনুমতি, সম্মতি ও সহমত অত্যাবশ্যক। আর এই কারণেই তো মহান আল্লাহ অভিভাবকদেরকে তাদের অভিভাবকত্বের অধিকারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। নবী করীম ﷺ-এর হাদীস দ্বারা এ কথার আরো সমর্থন হয়ে যায়। তিনি বলেন, "অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হয় না।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্য ঃ ইরওয়াউল গালীল ৬/২৩৫)* অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, "যে মহিলাই তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)* আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরীও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের মত এই হাদীসগুলোকে সহীহ ও হাসান বলে মেনে নিয়েছেন। *(ফাইযুল বারী ৪র্থ খন্ড)* আর দ্বিতীয় কথা যেটা জানা গেল তা হল, মহিলার অভিভাবকেরও তার (মহিলার) উপর জোর-জবরদস্তি করার অধিকার নেই। বরং তার জন্যও জরুরী যে, সে মহিলার মতামতের খেয়াল রাখবে। যদি অভিভাবক মহিলার সম্মতি ছাড়াই জোর ক'রে কারো সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে শরীয়ত সেই মহিলাকে আদালতের মাধ্যমে এই বিবাহ বানচাল করার অধিকার দিয়েছে। কাজেই জরুরী হল বিবাহে উভয় পক্ষেরই সম্মতি থাকা। কোন এক পক্ষ যেন নিজ খেয়াল-খুশীর মত কাজ না করে। যদি মহিলা অভিভাবকের মতামত ছাড়াই বিবাহ করে, তাহলে সে বিবাহই শুদ্ধ নয়। আর অভিভাবক যদি জোর করে এবং মেয়ের স্বার্থের উপর নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে আদালত এ রকম অভিভাবককে তার অভিভাবকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে অন্য অভিভাবক দ্বারা বা নিজেই অভিভাবক হয়ে সেই মহিলার বিবাহের কাজ সম্পাদন করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তারা আপোসে বিবাদে লিপ্ত হলে সরকার হবে তার অভিভাবক, যার কোন অভিভাবক নেই।" *(ইরওয়াউল গালীল)*

يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রমত। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

(২৩৩) জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়।[১২২] পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[১২৩] কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।[১২৪] আর (পিতা মারা গেলে) উত্তরাধিকারীর বিধানও অনুরূপ।[১২৫] পক্ষান্তরে যদি পিতা-মাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু' বছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না; যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর।[১২৬] আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا

(২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।[১২৭] যখন তারা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (সৌন্দর্যগ্রহণ বা বিবাহ) করলে, তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে

([১২২]) এই আয়াতে দুধপানের মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তা হল, যে ব্যক্তি দুধপানের নির্ধারিত সময় পুরা করতে চায়, সে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। এই শব্দগুলো থেকে এ কথাও ফুটে উঠে যে, দু'বছরের কমও দুধ পান করাতে পারে। আর দ্বিতীয় যে কথাটি জানা যায় তা হল, দুধপানের সর্বাধিক সময়সীমা হল, দু'বছর। মহানবী ﷺ বলেন, "সেই দুধপানই হারাম সাব্যস্ত করে, যা বুক থেকে বের হয়ে (খাদ্যের মত) নাড়িভুঁড়ি বিদীর্ণ করে এবং যা দুধ ছাড়ানোর সময়ের পূর্বে হয়।" *(তিরমিযী ১১৫২নং, দুধপান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ঃ শিশু অবস্থায় দু' বছরের ভিতরে ছাড়া দুধপান বিবাহ হারাম সাব্যস্ত করে না)* কাজেই দুধপানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন শিশু যদি কোন মহিলার ঐভাবে দুধ পান ক'রে নেয়, যেভাবে পান করলে দুধপান সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে দুধপানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে এবং দুধ ভাই-বোনদের মধ্যে আপোসের বিবাহ ঐরূপ হারাম হয়ে যাবে, যেরূপ রক্তের সম্পর্কের ভাই-বোনদের সাথে হারাম। মহানবী ﷺ বলেছেন, "দুধপানেও তা হারাম হয়, যা রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।" *(বুখারী ২৬৪৫নং)*

([১২৩]) مَوْلُودٌ لَـهُ বলতে পিতাকে বুঝানো হয়েছে। তালাক্ব হয়ে যাওয়ার পর দুধের শিশু ও তার মায়ের দেখা-শোনার ব্যাপারটা আমাদের সমাজে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর কারণ হল, শরীয়ত থেকে বিমুখতা। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী স্বামী যদি তার সাধ্যমত তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলার খাওয়া-পরার দায়িত্ব গ্রহণ করে যেভাবে এই আয়াতে বলা হচ্ছে, তাহলে অতি সহজেই সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

([১২৪]) মাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া যেমন, মা শিশুকে নিজের কাছে রাখতে চায়, কিন্তু মায়ের মমতার কোন পরোয়া না ক'রে শিশুকে জোর ক'রে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অথবা তার কোন ব্যয়ভার বহন না ক'রে তাকে দুধ পান করাতে বাধ্য করা। আর পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া যেমন, মায়ের দুধ পান করাতে অস্বীকার করা কিংবা তার (শিশুর পিতার) কাছ থেকে তার সাধ্যের বাইরে খরচ কামনা করা।

([১২৫]) (শিশুর) পিতার মৃত্যু হয়ে গেলে তার উত্তরাধিকারীরা এই দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে মায়ের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করবে, যাতে না মায়ের কোন কষ্ট হয়, আর না শিশুর লালন-পালনে কোন ব্যাঘাত ঘটে।

([১২৬]) শিশুর মা ব্যতীত অন্য মহিলা দিয়েও দুধ পান করানোর অনুমতি আছে। তবে শর্ত হল, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই মহিলারও পারিশ্রমিক আদায় ক'রে দিতে হবে।

([১২৭]) স্বামীর মৃত্যুর পর (শোক পালনের) এই ইদ্দত সকল নারীর জন্য, তাতে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক, যুবতী হোক বা বৃদ্ধা। অবশ্য গর্ভবতী মহিলা এই আওতায় পড়বে না। কারণ, তার ইদ্দতকাল হল সন্তানপ্রসব হওয়া পর্যন্ত। মহান আল্লাহ বলেন, "গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব হওয়া পর্যন্ত।" *(সূরা ত্বালাক্ব ৪ আয়াত)* স্বামী-মৃত্যুর এই ইদ্দতকালে মহিলার সাজ-সজ্জা করার (এমন কি সুর্মা লাগানো) এবং স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করার অনুমতি নেই। তবে রজয়ী তালাক্বপ্রাপ্তা (যাকে ফিরিয়ে নেওয়ার স্বামীর অধিকার থাকে এমন) মহিলার জন্য সাজ-সজ্জা করা নিষেধ নয়। আর তালাক্বে বায়েন প্রাপ্তা (যাকে যথাবিহিত ব্যবস্থা ছাড়া আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় এমন) মহিলার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, বৈধ এবং কেউ বলেছেন, অবৈধ। *(ইবনে কাসীর)*

না।[১২৮] তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

(২৩৫) আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না।[১২৯] আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা[১৩০] ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

(২৩৬) যদি তোমরা স্পর্শ করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত (ক্ষতিপূরণ) খরচপত্র দিও, সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং গরীব লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়মমত (ক্ষতিপূরণ) খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সৎকর্মশীল লোকেদের পক্ষে (অবশ্য) কর্তব্য।[১৩১]

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

([১২৮]) অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি সাজ-সজ্জা করে এবং অভিভাবকদের অনুমতি ও তাদের পরামর্শক্রমে অন্যত্র বিবাহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কাজেই (হে মহিলার অভিভাবকগণ) তোমাদেরও কোন পাপ নেই। এ থেকে জানা গেল যে, বিধবা-বিবাহকে খারাপ ভাবা উচিত নয়, উচিত নয় তাতে বাধা দেওয়া। যেমন হিন্দু-প্রভাবান্বিত মুসলিম সমাজে এমন আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

([১২৯]) এখানে বিধবা অথবা তালাক্বে বায়েনা তথা তিন তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, ইদ্দতের মধ্যে তোমরা তাকে ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম দিতে পারো (যেমন এ রকম বলা যে, আমার বিবাহ করার ইচ্ছা আছে বা আমি একজন সৎশীলা মহিলার খোঁজ করছি ইত্যাদি)। কিন্তু তার নিকট থেকে গোপনভাবে কোন অঙ্গীকার নেবে না এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ পাকা করবে না। পক্ষান্তরে যে মহিলাকে তার স্বামী এক বা দু' তালাক্ব দিয়েছে, তাকে ইদ্দতের মধ্যে ইশারা-ইঙ্গিতেও বিবাহের পয়গাম দেওয়া জায়েয নয়। কেননা, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উপর স্বামীরই অধিকার থাকে। হতে পারে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেবে।

মাসআলা ঃ কখনো কখনো এমনও হয় যে, কোন কোন অজ্ঞ লোক মহিলার ইদ্দতের মধ্যেই বিবাহ ক'রে নেয়। তাদের ব্যাপারে নির্দেশ হল, যদি তাদের মধ্যে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে সত্বর তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হবে। আর যদি সহবাস হয়ে থাকে, তবুও তাদেরকে একে অপর থেকে পৃথক তো করতেই হবে, কিন্তু পুনরায় (ইদ্দত শেষ হওয়ার পর) তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে কি না --এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেমদের মত হল, তাদের মধ্যে আর কখনোও বিবাহ হতে পারে না। এরা একে অপরে জন্য চিরকালের মত হারাম। তবে অধিকাংশ উলামার মতে তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ হতে পারে। *(ইবনে কাসীর)*

([১৩০]) এ থেকে উদ্দেশ্য, ইশারা-ইঙ্গিত যা পূর্বে বলা হয়েছে। যেমন বলা, তোমার ব্যাপারে আমি আকাঙ্ক্ষা করি অথবা তার অভিভাবককে বলা যে, তার বিবাহের ব্যাপারে ফায়সালা করার পূর্বে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ইত্যাদি। *(ইবনে কাসীর)*

([১৩১]) এ নির্দেশ এমন মহিলার জন্য, বিবাহের সময় যার দেনমোহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামী সহবাসের পূর্বেই যাকে তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে, (বলা হচ্ছে,) তাকে কিছু না কিছু খরচপত্র (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) দিয়ে বিদায় কর। এ খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত। সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছলরা তাদের সাধ্য মুতাবেক প্রদান করবে। সৎকর্মশীলদের পক্ষে এটা জরুরী কর্তব্য। আর খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণের এই জিনিসকে নির্দিষ্টও করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, একটি খাদেম। কেউ বলেছেন, ৫০০ দিরহাম। কেউ বলেছেন, এক বা একাধিক জোড়া কাপড় ইত্যাদি। তবে এ নির্দিষ্টীকরণ শরীয়ত কর্তৃক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাধ্য অনুযায়ী দেওয়ার এখতিয়ার এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক প্রকার তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলাকে দেওয়া জরুরী; কেবল সেই তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলার জন্য নির্দিষ্ট নয়, যার কথা এই আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কুরআন কারীমের আরো অন্যান্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা প্রত্যেক প্রকার তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলার জন্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন। খরচপত্র বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু জিনিস দেওয়ার মধ্যে যে হিকমত, যৌক্তিকতা ও সুফল আছে তা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। তালাক্বের কারণ স্বরূপ তিক্ততা, মন কষাকষি এবং মতবিরোধের সময়ে মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তার হার্দিক প্রশান্তি ও আন্তরিক তুষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিবাদের পথ রোধ করার জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু আমাদের সমাজে এই অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণের পরিবর্তে তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলাকে এমন নাজেহাল ক'রে বিদায় করা হয় যে, উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

(২৩৭) যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য ক'রে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে।[১৩২] কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন[১৩৩] সে যদি মাফ ক'রে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা।) অবশ্য তোমাদের মাফ ক'রে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ (٢٣٨)

(২৩৮) তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি।[১৩৪] আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)

(২৩৯) যদি তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়ে নাও)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।[১৩৫]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

(২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয়[১৩৬] এবং গৃহ থেকে বের ক'রে দেওয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায়, তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

(২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণও যথাবিহিত খরচপত্র (ক্ষতিপূরণ) পাবে। সাবধানীদের জন্য এ (দান) অবশ্য

চিরকালের জন্য বিদ্বেষপূর্ণ রয়ে যায়।

([১৩২]) এখানে আর এক নিয়মের কথা বলা হচ্ছে, সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মোহর নির্ধারিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য জরুরী হল অর্ধেক মোহর আদায় করা। কিন্তু স্ত্রী যদি তার মোহরের অধিকার মাফ ক'রে দেয়, তাহলে স্বামীকে কিছুই দিতে হবে না।

([১৩৩]) এ থেকে স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিবাহের বন্ধন (অটুট রাখা না রাখার এখতিয়ার) তার হাতেই। সে অর্ধেক মোহর মাফ ক'রে দেয়। অর্থাৎ, আদায়কৃত মোহর থেকে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে নিজের এ অধিকার (অর্ধেক মোহর) মাফ ক'রে দিয়ে সম্পূর্ণ মোহর স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। এরপর পারস্পরিক সহানুভূতি ও অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত না হওয়ার তাকীদ ক'রে মোহরের অধিকারেও এই সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপর অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ কেউ কেউ [بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ] (যার হাতে বিবাহ-বন্ধন) থেকে মহিলার অভিভাবককে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মহিলা নিজে মাফ ক'রে দিক অথবা তার অভিভাবক মাফ ক'রে দিক। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, প্রথমতঃ অভিভাবকের হাতে বিবাহের বন্ধন নেই। দ্বিতীয়তঃ মোহর মহিলার নিজস্ব অধিকার ও তার ব্যক্তিগত সম্পদ, তাই এটা মাফ করার অধিকার অভিভাবকের নেই। সুতরাং পূর্বের অর্থই সঠিক। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

জরুরী বিশ্লেষণ ঃ তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলারা চার ধরনের। (ক) যার মোহর নির্ধারিত, স্বামী তার সাথে সহবাসও করেছে, তাকে তার মোহরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। যেমন, ২২৯নং আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। (খ) মোহরও নির্ধারিত নেই এবং তার সাথে সহবাসও করা হয়নি, তাকে কেবল কিছু খরচপত্র দেওয়া হবে। (গ) মোহর নির্ধারিত, কিন্তু সহবাস হয়নি, তাকে অর্ধেক মোহর দেওয়া জরুরী। (উভয়ের ব্যাখ্যা ২৩৬-২৩৭ নং আয়াতে বিদ্যমান।) (ঘ) মোহর নির্ধারিত নেই, কিন্তু সহবাস করা হয়েছে, তার জন্য রয়েছে মোহরে মিস্‌ল। অর্থাৎ, এই মহিলার সমাজে যে পরিমাণ মোহরের প্রচলন আছে অথবা তার মত মহিলাদের সাধারণতঃ যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয়, তাকেও সে পরিমাণ মোহর দিতে হবে। *(নাইনুল আওত্বার ও আ'উনুল মা'বুদ)*

([১৩৪]) মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। রসূল ﷺ-এর সেই হাদীস দ্বারা এটা নির্দিষ্ট, যাতে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি 'সালাতে উসত্বা'কে আসরের নামায বলে অভিহিত করেছেন। *(বুখারী ২৯৩১-মুসলিম ৬২৭নং)*

([১৩৫]) অর্থাৎ, শত্রুর ভয়ের সময় যেভাবে সম্ভব; হাঁটতে হাঁটতে অথবা বাহনের উপর বসে নামায পড়ে নাও। অতঃপর যখন ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে যাবে, তখন পুনরায় সেইভাবে নামায পড়, যেভাবে তোমাদেরকে শিখানো হয়েছে।

([১৩৬]) এই আয়াত ক্রমানুসারে পরে উল্লিখিত হলেও তা মানসুখ (রহিত)। এর রহিতকারী (২৩৪নং) আয়াত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যাতে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশদিন বলা হয়েছে। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াত স্ত্রীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই স্বামীকে স্ত্রীর জন্য কোন প্রকারের অসিয়ত (উইল) করার প্রয়োজন নেই। না বাসস্থানের, আর না খাওয়া-পরার।

কর্তব্য।[১৩৭]

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)

(২৪২) এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)

(২৪৩) তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' পরে তাদেরকে জীবিত করলেন।[১৩৮] নিশ্চয়, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)

(২৪৪) তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

(২৪৫) কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?[১৩৯] আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا

(২৪৬) তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি?[১৪০] যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের

([১৩৭]) এটা এক সাধারণ নির্দেশ, যাতে সকল তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলারাই শামিল। এতে বিচ্ছেদের সময় (মহিলার সাথে) সদ্ব্যবহার এবং তার মানসিক খুশির প্রতি যত্ন নেওয়ার উপর তাকীদ করা হয়েছে। আর এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সামাজিক উপকারিতা। কতই না ভাল হত, যদি মুসলিমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশের উপর আমল করত; যা তারা একেবারে ভুলে বসেছে। ইদানিং কোন কোন তথাকথিত 'মুজতাহিদ' (?) «مَتَاعٌ» এবং «مُتْعُوهُنَّ» (খরচপত্র দাও) থেকে সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন যে, তালাক্বপ্রাপ্তা মহিলাকে নিজের সম্পদ থেকে অংশ দিতে হবে অথবা চিরজীবন তার ভরণ-পোষণ করতে হবে। অথচ এই উভয় কথাই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। যে মহিলাকে স্বামী অপছন্দ ক'রে নিজের জীবন থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে, চিরজীবন তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য সে কিভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে?

([১৩৮]) এ ঘটনা বিগত কোন জাতির। কোন সহীহ হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। তফসীরের বর্ণনায় এটাকে বনী-ইস্রাঈলদের যুগের ঘটনা বলা হয়েছে এবং যে নবীর দুআয় তাদেরকে মহান আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন, তাঁর নাম 'হিযক্বীল' বলা হয়েছে। এরা জিহাদে নিহত হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা মহামারী রোগের ভয়ে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল; যাতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে প্রথমতঃ এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে বেঁচে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এও জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হলেন মহান আল্লাহ। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা পুনরায় সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত মানুষকে ঐভাবেই জীবিত করবেন, যেভাবে তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে জীবিত করে দিলেন। পরের আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। জিহাদের পূর্বে এই ঘটনা বর্ণনা করার যৌক্তিকতা হল, জিহাদ থেকে পিছপা হয়ো না। জীবন ও মরণ তো আল্লাহর হাতে এবং এই মরণের সময়ও নির্ধারিত। অতএব জিহাদ থেকে পালিয়ে তা রোধ করতে পারবে না।

([১৩৯]) قَرْضٌ حَسَنٌ (উত্তম ঋণ) প্রদান করার অর্থ আল্লাহর পথে এবং জিহাদে মাল ব্যয় করা। অর্থাৎ, জানের মত মালের কুরবানী দিতেও দ্বিধা করো না। রুযীর প্রসারণ ও সংকোচনের এখতিয়ার কেবল আল্লাহরই হাতে। তিনি উভয়েরই মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন; কখনো রুযী হ্রাস করে এবং কখনো তার প্রসার ঘটিয়ে। অতএব আল্লাহর পথে ব্যয় করলে কমে না, বরং মহান আল্লাহ এতে অনেক অনেক বৃদ্ধি দান করেন। কখনো বাহ্যিকভাবে, আবার কখনো অভ্যন্তরীণভাবে মালে বর্কত দিয়ে। আর আখেরাতে যে বৃদ্ধি হবে তা অবশ্য অবশ্যই বিস্ময়কর হবে।

([১৪০]) مَلَأ কোন জাতির এমন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে বলা হয়, যারা বিশেষ উপদেষ্টা ও নেতা হন। যাদেরকে দেখলে চোখ ও অন্তর প্রতাপে ভরে যায়। مَلَأ এর আভিধানিক অর্থ ভরে যাওয়া। *(আইসারুত তাফাসীর)* যে নবীর কথা (আয়াতে) উল্লেখ হয়েছে, তার নাম 'শামবীল' বলা হয়। ইবনে কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার সার কথা হল, বানী-ইস্রাঈল মূসা ﷺ-এর পর কিছুকাল পর্যন্ত সঠিক পথেই ছিল। তারপর তাদের মধ্যে বিমুখতা এল। দ্বীনে নতুন নতুন বিদআত আবিষ্কার করল। এমন কি মূর্তিপূজাও আরম্ভ করে দিল। নবীগণ তাদেরকে বাধা দিলেন, কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও শির্ক থেকে বিরত হল না। ফলে আল্লাহ তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর আধিপত্য দান করলেন। তারা ওদের অঞ্চল ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং ওদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক মানুষকে বন্দী করল। তাদের মধ্যে নবী আগমনের ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে গেল। শেষে কিছু লোকের দুআয় শামবীল নবী ﷺ জন্ম লাভ করলেন। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। তারা নবীর কাছে দাবী পেশ করল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্বাচিত করে দিন; আমরা তার নেতৃত্বে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। নবী তাদের অতীত চরিত্রের আলোকে বললেন, তোমরা দাবী তো করছ, কিন্তু আমার অনুমান তোমরা তোমাদের কথার উপর অটল থাকবে না। সুতরাং সেই রকমই হল, যে রকম কুরআন বর্ণনা করেছে।

لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦)

জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর,[১৪১] যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বলল, 'বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?' তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না কেন?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

(২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কিরূপে আমাদের উপর রাজা হতে পারে, অথচ রাজা হওয়ার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার; তাছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি। নবী বলল, আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) জ্ঞানে এবং দেহে (পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন।[১৪২] বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময়।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

(২৪৮) তাদের নবী তাদেরকে আরও বলল, নিশ্চয় তাঁর রাজত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে;[১৪৩] যাতে আছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

([১৪১]) নবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজা নিযুক্ত করার দাবী পেশ করা, রাজতন্ত্র বৈধতার দলীল। কেননা, যদি রাজতন্ত্র বৈধ না হত, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং ত্বালূতকে তাদের জন্য রাজা নিযুক্ত করে দিলেন; যাঁর কথা পরে আসছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজা যদি লাগামহীন স্বেচ্ছাচারী না হয়ে আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি যত্নবান এবং ন্যায়পরায়ণ হন, তাহলে তাঁর রাজত্ব কেবল বৈধই নয়, বরং কাম্য এবং বাঞ্ছনীয়ও। *(অধিক জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ সূরা মায়েদা ২০নং আয়াতের টীকা)*

([১৪২]) ত্বালূত সেই বংশের ছিলেন না, যে বংশ থেকে ধারাবাহিকতার সাথে বানী-ইস্রাঈলদের মধ্যে রাজাদের আগমন ঘটেছে। তিনি দরিদ্র ও সাধারণ একজন সৈনিক ছিলেন। তাই তারা অভিযোগ করল। নবী বললেন, এটা তো আমার নির্বাচন নয়, বরং মহান আল্লাহ তাঁকে নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার জন্য সম্পদের চেয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন বেশী এবং এতে (জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে) তিনি তোমাদের সবার ঊর্ধ্বে। আর এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহদানে ধন্য করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। অর্থাৎ, তিনি জানেন যে, রাজত্ব পাওয়ার কে যোগ্য এবং কে অযোগ্য। (মনে হয় যখন তাদেরকে বলা হল যে, এই মনোনয়ন মহান আল্লাহ কর্তৃক, তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো কোন নিদর্শন কামনা করে, তাই পরের আয়াতে আরো একটি নিদর্শনের বর্ণনা এসেছে।)

([১৪৩]) সিন্দুক অর্থাৎ, তাবূত বা শবাধার। تابوت শব্দটি توب ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ হল, প্রত্যাবর্তন করা। যেহেতু বানী-ইস্রাঈল বর্কত অর্জনের জন্য এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করত, তাই এর নাম তাবূত রাখা হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এই সিন্দুকে মূসা এবং হারূন (আলাইহিমাস্সালাম)-এর বর্কতময় কিছু জিনিস ছিল। এই সিন্দুকও তাঁদের শত্রুরা তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ নিদর্শনস্বরূপ ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে এই সিন্দুক ত্বালূতের দরজায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তা দেখে বানী-ইস্রাঈল আনন্দিতও হল এবং মেনেও নিল যে, এটি ত্বালূতের রাজত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিদর্শন। অনুরূপ মহান আল্লাহ এটিকে তাদের জন্য একটি অলৌকিক নিদর্শন এবং বিজয় লাভের ও তাদের মনের প্রশান্তির উপকরণ করেন। মনের প্রশান্তির অর্থই হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর খাস বান্দাদের উপর এমন বিশেষ সাহায্যের অবতরণ, যার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দানে যখন বড় বড় সিংহের মত বীরদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তখন ঈমানদারদের অন্তর শত্রুর ভয় থেকে শূন্য এবং বিজয় ও সফলতা অর্জনের আশায় পরিপূর্ণ থাকে।

এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে, আম্বিয়া ও সালেহীনদের বর্কতময় জিনিসের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অনুমতিক্রমে গুরুত্ব ও উপকারিতা আছে। তবে শর্ত হল এই যে, তা সত্যপক্ষেই বর্কতময় (এবং নবীদের ব্যবহৃত) হতে হবে; যেমন উক্ত তাবূতে নিঃসন্দেহে হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের কিছু বর্কতময় জিনিস রাখা ছিল। বলা বাহুল্য, মিথ্যা দাবীর ফলে কোন জিনিস বর্কতময় হয়ে যায় না। যেমন বর্তমানে বর্কতময় জিনিসের নামে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন জিনিস রাখা আছে, অথচ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার সত্যতার কোন প্রমাণ মিলে না। অনুরূপ মনগড়াভাবে কোন জিনিসকে বর্কতময় বানিয়ে নিলে, তাও কোন উপকারে আসে না। যেমন কিছু লোক মহানবী ﷺ-এর বর্কতময় জুতার মূর্তি বানিয়ে নিজের পাশে রাখে অথবা বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে অথবা বিশেষ পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ ও বিপদ দূর হবে বলে মনে ক'রে থাকে। এইভাবে কবরে বুযুর্গদের নামে নিবেদিত নযর ও নিয়াযের জিনিসকে এবং তবরুকের খানাকে অনেকে

مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨)

তোমাদের জন্য প্রশান্তি এবং কিছু পরিত্যক্ত জিনিস যা মূসা ও হারুনের বংশধরগণ রেখে গেছে; ফিরিশ্তাগণ সেটি বহন করে আনবে। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)

(২৪৯) অতঃপর তালূত যখন সৈন্যদলসহ বের হল, তখন সে বলল, 'আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন।[১৪৪] অতএব যে কেউ উক্ত নদী থেকে পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং যে ঐ পানি পান করবে না, সে আমার দলভুক্ত। অবশ্য যে কেউ তার হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি পান করবে সে-ও (আমার দলভুক্ত)।' কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে হাজির হল, তখন) তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ লোকই তা থেকে পানি পান করল।[১৪৫] অতঃপর যখন সে (ত্বালূত) ও তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ তা (নদী) অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, 'আমাদের শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালূত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করি।'[১৪৬] কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠)

(২৫০) তারা যখন (যুদ্ধার্থে) জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদেরকে অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।'[১৪৭]

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ

(২৫১) সুতরাং তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল।[১৪৮] আল্লাহ তাকে

বর্কতময় মনে ক'রে থাকে। অথচ এ হল গায়রুল্লাহর নামে নিবেদন ও অমূলক বিশ্বাস; যা শির্কের আওতাভুক্ত। এই শ্রেণীর খাবার খাওয়া নিঃসন্দেহে হারাম। কোন কোন কবরের গোসল দেওয়া হয় এবং তার পানিকে বর্কতময় মনে করা হয়। অথচ কবরের গোসল দান কা'বাগৃহের গোসল দেওয়ার নকল; যা বৈধই নয়। পক্ষান্তরে গোসলে ব্যবহৃত এ নোংরা পানি কিভাবে বর্কতময় হতে পারে? বলাই বাহুল্য যে, এ শ্রেণীর অমূলক বিশ্বাস ও বর্কত বা তবরুকের ধারণা ভ্রান্ত ও শির্ক; ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(১৪৪) এই নদীটি জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

(১৪৫) আমীরের আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় জরুরী। আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার সময় তো তার (আমীরের আনুগত্য করার) গুরুত্ব দ্বিগুণ নয়, বরং শতগুণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে সফলতা অর্জনের জন্য জরুরী হল, সৈন্যের যুদ্ধকালীন সময়ের ক্ষুৎপিপাসা এবং অন্যান্য কষ্ট অতীব ধৈর্যের সাথে সহ্য করা। তাই এই দু'টি বিষয়ে তরবিয়াত এবং পরীক্ষার জন্য ত্বালূত বললেন, নদীতে তোমাদের প্রথম পরীক্ষা হবে। যে এই নদীর পানি পান করবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকেরাই পানি পান করে নেয়। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ যারা পান করেনি, তাদের সংখ্যা ৩১৩ বলা হয়েছে, যা ছিল বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(১৪৬) এই ঈমানদাররাও যখন শুরুতে দেখল শত্রুর সংখ্যা অনেক, তখন তাদের সংখ্যা (শত্রুর তুলনায়) কম থাকায় তারা এই মত প্রকাশ করল। তখন তাদের আলেমগণ এবং যারা আল্লাহর সাহায্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা বললেন, সফলতা সংখ্যার আধিক্যের এবং অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য জরুরী হল ধৈর্যের প্রতি যত্ন নেওয়া।

(১৪৭) জালূত সেই শত্রুদলের সেনাপতি ও দলনেতা ছিল, যাদের সাথে ত্বালূত ও তাঁর সঙ্গীদের সংঘর্ষ ছিল। এরা ছিল আমালেক্বা জাতি। সেই সময়ে এই জাতি বড় দুর্ধর্ষ যুদ্ধ-বিশারদ এবং বীর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের এই প্রসিদ্ধির কারণে ঠিক যুদ্ধের সময় ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকার তওফীক চেয়ে এবং কুফ্রীর মোকাবেলায় ঈমানের সফলতার জন্য দুআ করেন। অর্থাৎ, (যুদ্ধের) পার্থিব উপকরণাদি গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, এ রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করা। যেমন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ অত্যধিক কাকুতি-মিনতির সাথে বিজয় ও সাহায্য চেয়ে দুআ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সে দুআ কবুল করেছিলেন। ফলে অতীব অল্প সংখ্যক মুসলিম দল অধিক সংখ্যক কাফের দলের উপর জয় লাভ করেছিল।

(১৪৮) দাউদ عليه السلام তখন না নবী ছিলেন, না রাজা। বরং ত্বালূতের সৈন্যদলের একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। তাঁরই হাতে মহান আল্লাহ জালূতকে ধ্বংস করলেন এবং অল্প সংখ্যক ঈমানদার দ্বারা বিশাল এক জাতিকে জঘন্যভাবে পরাজিত করলেন।

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١)

রাজত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন[১৪৯] এবং তিনি ইচ্ছানুযায়ী তাকে শিক্ষা দান করলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে নিশ্চয় পৃথিবী (অশান্তিপূর্ণ ও) ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।[১৫০]

تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)

(২৫২) এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন; যা আমি যথাযথভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। আর নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম।[১৫১]

([১৪৯]) এর পর মহান আল্লাহ দাঊদ ﷺ-কে রাজত্বও দিলেন এবং নবুঅতও। 'হিকমত' বলতে কেউ বলেছেন, নবুঅত। কেউ বলেছেন, লোহার কারিগরী এবং কেউ বলেছেন, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়ের এমন পারদর্শিতা, যা আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত স্থানে বড় নিষ্পত্তিকর সাব্যস্ত হয়েছিল।

([১৫০]) এখানে আল্লাহর এক নিয়মের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদল মানুষের মাধ্যমেই অপর একদল মানুষের যুলুম-অত্যাচার ও ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন ক'রে থাকেন। তিনি যদি এ রকম না ক'রে কোন একই পক্ষকে সব সময়ের জন্য ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়ে রাখতেন, তাহলে এ পৃথিবী যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কাজেই আল্লাহর এই নিয়ম বিশ্ববাসীর জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ সূরা হজ্জের ৩৮ ও ৪০ নং আয়াতেও এ কথা উল্লেখ করেছেন।

([১৫১]) অতীতের যে ঘটনাগুলো রসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে, হে মুহাম্মাদ! অবশ্যই সে সমস্ত ঘটনাগুলো তোমার রিসালাত ও সত্যতার দলীল। কারণ, এগুলো না তুমি কোন কিতাবে পড়েছ, আর না কারো কাছ থেকে শুনেছ। আর এ থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এগুলো সব অদৃশ্য জগতের (গায়বী) খবরাদি, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন কারীমের বহু স্থানে অতীত উম্মতের ঘটনাবলী রসূল ﷺ-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে।